স্বস্তিকা

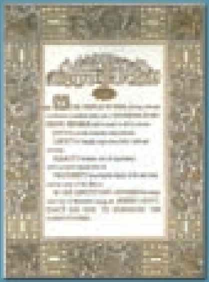

ভারতীয় সংবিধানের হিন্দুত্বনিষ্ঠ আত্মা

...পৃঃ ২৭

বাজার অর্থনীতি অভিমুখ কোনদিকে

...পৃঃ ২৯

৬৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা || ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ || ১০ ফাল্গুন - ১৪২১ || website : www.eswastika.com || দাম : দশ টাকা

ভয়াবহ জল-দূষণ

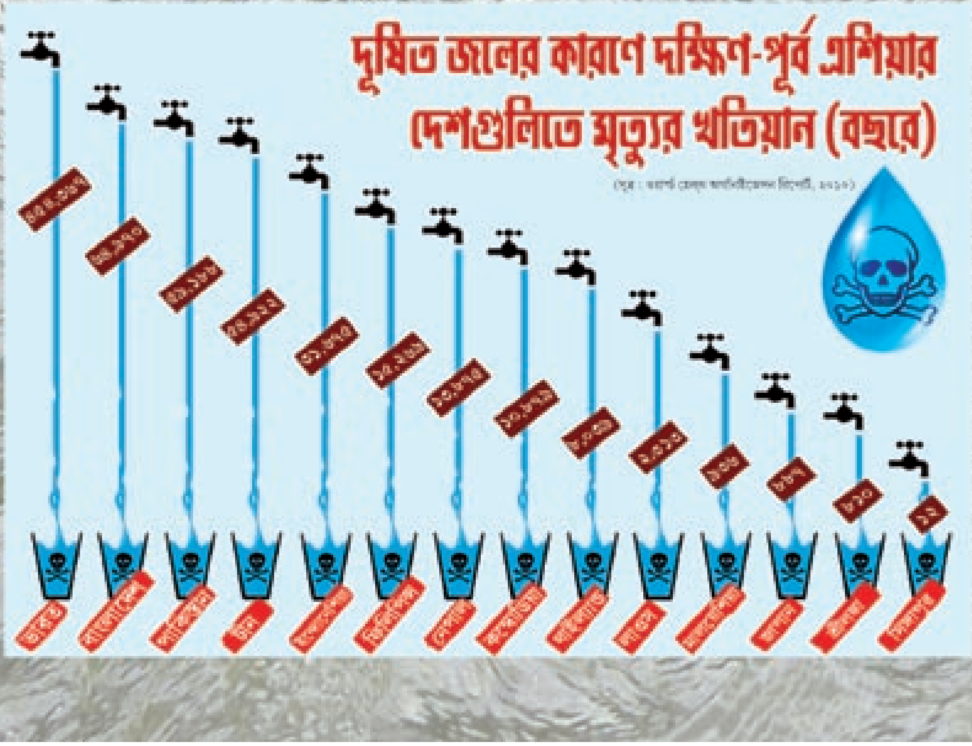

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ১০ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৩ ফেব্রুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-১০
খোলা চিঠি : মোদী ভারত চালান, বাংলা একাই চলবে □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
অপরীক্ষিতের আকর্ষণ □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১২
গঙ্গাদূষণ : প্রতিরোধের প্রচেষ্টা □ সুনির্মল চন্দ □ ১৩
তারাপীঠের নদী দূষণের দায়িত্ব ধর্মীয় সংস্থাকেই নিতে হবে □ মোহিত রায় □ ১৭
একটু ভাবুন □ সঞ্জীব বাগচী □ ২০
বিলুপ্ত বিদ্যা : শবসাধনা □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১
ভারতীয় সংবিধানের হিন্দুত্বনিষ্ঠ আত্মা □ মুজফ্ফর হোসেন □ ২৭
বাজার অর্থনীতি ও অর্থনীতিতে বাজার : অভিমুখ কোন দিকে □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ২৯
নন্দীগ্রাম ও দোনো চম্পট □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩১
শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ □ স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭- ৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সামাজিক সমতা ও দোল উৎসব

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘রঙ যেন মোর মর্মে লাগে। আমার সকল কর্মে লাগে।’ দোলের এই দার্শনিক তাৎপর্য আজও আমরা উপলব্ধি করছি। রঙের উৎসব তাই এখন কারোর কাছে ধর্মীয় আচার-বিচার, কারোর কাছে-বা আনন্দ-উৎসবের। দোলে বসন্তের দখিনা বাতাস মনে দোলা লাগায় ঠিকই, কিন্তু সেই শিহরনে যেন আমাদের কর্তব্য বিস্মৃত না করে। এই রঙ দিয়েই আমরা ঢেকে দিতে পারি জাতপাতের যাবতীয় কালিমা। এই আশায় দোলা লাগে যে, সামাজিক অভিশাপের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ‘ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’। লিখেছেন : ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ, সারথি মিত্র প্রমুখ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনীতিকরা প্রতিশ্রুতি পালনেই দেবতা হন

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ দেশকে, বিশেষ জাতিকে, বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল'। কিন্তু নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ভগবান হইতে চাহেন নাই কখনই। তাই তাঁহার নামে মন্দির তৈয়ারি করিবার কথা শুনিয়াই তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। হতাশা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'এই ধরনের মন্দির নির্মাণ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এই ধরনের মন্দির নির্মাণ করিতে শিখায় না।' সত্যই যে পাষাণ মূর্তি কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহলে সম্পূর্ণ বধির তাহার পক্ষে মানুষের সেবা উপকার করা সম্ভব নহে। নরেন্দ্র মোদী ভোটে লড়াই করিয়া ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন দেবতা হইবার জন্য নহে, বরঞ্চ দেশের কল্যাণের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। আর এই প্রসঙ্গেই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'যে দেশের জন্য ভাবে তাহাকে নিজের জন্য আলাদা করিয়া আর ভাবিতে হয় না, দেশের সহিত তাহার নিজেরও ভাগ হইয়া যায়।' বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই একটু অন্যভাবে বলিয়াছেন, 'সর্বান্তঃকরণে এবং কোনো ফল কামনা না করিয়া এইরূপ বুদ্ধিতে সেবা করিতে পারিলে ভগবানের কৃপায় একদিন উপলব্ধি হইয়া যায়—যথার্থ নারায়ণ সেবাই জীবসেবা। কারণ তিনি প্রত্যেক জীবে বিভুরূপে বিরাজমান, বাস্তবিক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।' মানুষের ধর্ম হইতেছে—পরস্পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা—পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু ভগবানের ধর্ম হইতেছে প্রার্থিত ভক্তকে কৃপা করা। শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে কৃপা পাওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সকল ধর্ম সকল বর্ণের মানুষের জন্য কাজ করিতে হইবে। ভারতীয় সংবিধান তাঁহাকে সেই দায়িত্ব দিয়াছে। সমর্থকেরা তাঁহাকে ভগবান বানাইতে পারে কিন্তু তাঁহার নিজের ভগবান সাজিবার বাসনা নাই বলিয়াই তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভক্তের কাছে ভক্তি বড়, জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান বড় আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে বড় প্রত্যাশা জনকল্যাণ।

মানুষের প্রধান শিক্ষার বিষয় সর্ববিধ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। নিজে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া না যাইলে অন্যের দুঃখকষ্ট অনুভব করা সম্ভব নহে—এই উপলব্ধি করিয়াই ভারতের নিরন্ন দরিদ্র জনগণ একজন সামান্য চা-ওয়ালাকে বিপুল ভোটে জয়ী করিয়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাইয়াছেন। যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি ভোট পাইয়াছেন তাহার সামান্য অংশ পূরণ করিলেই তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইবেন। বাংলার মানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মনে রাখিয়াছে এই জন্যই। দেশের মানুষ ড. শ্যামাপ্রসাদকে মনে রাখিয়াছে এই কারণেই। ভগবানের মন্দির ভক্তের হৃদয়ে, সেইজন্য আলাদাভাবে মন্দির গঠন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। মানুষ ভালো কাজের মাধ্যমেই দেবত্বে উন্নীত হন। সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতাই মানুষকে দেবতা করে। আমাদের জীবনই উপনিষদ। ইহার মধ্যেই শাস্ত্রের মর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই বলিয়াছেন, 'মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়েছে।'

সুভাষিত

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যতি বর্বরাঃ।।

রাজা কানের দ্বারা দেখেন, পণ্ডিত বুদ্ধির দ্বারা দেখেন। পশুরা গন্ধের দ্বারা দেখে, আর মূর্খরা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দেখতে পায়।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে খুঁজে পেতে নিখিল বিশ্বের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একদিকে ইসলামিক জেহাদি, অন্যদিকে চার্চের অর্থানুকূল্যে চলা তাদের প্রকাশ্য সংগঠনের দরুন যখন বিশ্বজুড়ে অসহিষ্ণুতা তৈরি হচ্ছে, তখন ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের এক অভিনব উদ্যোগ লক্ষ্য করল বিশ্ব। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজ (আই সি সি এস)-এর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারির ১ থেকে ৪ তারিখ কর্নাটকের মহীশূরে আয়োজিত হলো বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রবীণদের পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সারা বিশ্বের ৪০টি দেশের ও ৭৩টি বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রায় ৩০০ প্রবীণ জড়ো হয়েছিলেন চারদিনের জন্য। সম্মেলনের মূল থিম ছিল 'বিশ্ববাসীর ভালো হোক : প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়গুলি বেঁচে থাকুক'। এই সম্মেলনের আহ্বান ছিল, 'ঐক্যবদ্ধ মাতৃ-বিশ্বের সন্তান'। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, গণপতি সচ্চিদানন্দ স্বামীজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সরসঙ্ঘচালক তাঁর ভাষণে বলেন, 'বিশ্বের মঙ্গল করতে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি ভিত্তিমূল তৈরি করবে। অতঃপর আপনাদের কর্তব্য পৃথিবীকে ভালো রাখতে আপনার মননকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা এবং এর উপসংহারকে স্বেচ্ছাকৃত কর্মে পর্যবসিত করা। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সনাতন ভারতবর্ষের যাবতীয় সমর্থন আপনারা পাবেন।'

সম্মেলনের উদ্বোধন।

বিশ্বের বহু প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিনিধি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দেন। নিউজিল্যান্ডের মাওরিসরা ছাড়াও ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও এশিয় দেশগুলির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রবীণেরা এই সম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন। আই সি সি এসের এধরনের উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়। এটি পঞ্চম সম্মেলন। ইতিপূর্বে আরও চারটি সম্মেলন হয়েছে--- প্রথমটি ৪-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩-এ মুম্বাইতে। দ্বিতীয়টি জয়পুরে ৫-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। তৃতীয়টি ২০০৯-এর ৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে এবং চতুর্থটি ২০১২ সালের ৪-৭ মার্চ হরিদ্বারে। স্পষ্টতই প্রতি তিনবছর অন্তর আয়োজিত বিশ্বের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিরাজমান প্রবীণদের এহেন সম্মেলন পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। আর এস এসের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক প্রয়াত কে এস সুদর্শন জয়পুরে অনুষ্ঠিত এর দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

বিশ্ব ইয়েজিদি সম্প্রদায়ের প্রায় পনেরজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন শুধুমাত্র তাঁদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করতেই নয়, একইসঙ্গে আই এস আই এস জেহাদিদের হাত থেকে তাঁদের সম্প্রদায়কে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এছাড়া সম্মেলনের অন্য প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রার্থনা রীতির যে সাবেকিয়ানা তুলে ধরেন তাতে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্য হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবই প্রতিফলিত হয়। যেমন লিথুয়ানিয়ার এক প্রবীণ বলেন, তাঁরা অগ্নির উপাসক এবং ভারতবর্ষ তাঁর মাতৃভূমি। আবার রোবা ঐতিহ্যের ইয়া ইরকাশি বলেন, তাঁরা প্রকৃতির পূজারি। এই একই প্রতিধ্বনি শোনা যায় গিলবার্ট সায়েনজ্-এর কণ্ঠেও। বর্তমান আমেরিকার কেটাও জাতির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ওকলাহোমার এই বাসিন্দাটি। আরও একধাপ এগিয়ে ক্রাইজাইজ সংস্কৃতির প্রতিনিধি তো প্রকৃতিকে তাঁদের ভগবানেরই পর্যায়ভুক্ত করেন।

প্রকৃতিকে উপাসনার ঐতিহ্য যে ভারত-ই বিশ্বকে দান করেছে এঁরা তা সার্থকভাবে তুলে ধরেন। অন্যদিকে হাঙ্গেরির একটি প্রাচীন জনজাতির এক প্রবীণ স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে, তাঁদের আদিভূমি বিহারে। এভাবেই নিখিল বিশ্বকে আত্তীকরণের সনাতন ঐতিহ্য এবছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের ক'টা দিন প্রত্যক্ষ করলেন পৃথিবীবাসীরা।

মধ্যপ্রদেশে গড়ে উঠবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগামী বছর মধ্যপ্রদেশবাসী পেতে চলেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় ৭৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে জানা যায়। প্রায় ১৫০০ হেক্টর জমির উপর ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ হতে চলেছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ক্যালির্ফোনিয়ার মরুভূমিতে গড়ে ওঠা ৫৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ চালিত শক্তির তুলনায় যার উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। এই প্রকল্প মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং সোলার এনার্জি করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে গড়ে তুলবে

বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন দেশের অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের প্রতিনিধিদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পুরাণে সূর্যের রথের সাতটি ঘোড়ার মতো অপ্রচলিত শক্তিরও বিভিন্ন ধারা, যেমন গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি। প্রকল্প গড়ে তুলতে এক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ জমির মালিকানাধীন সরকার নিজের হাতেই রাখবে আর বাকি ৩০০ হেক্টর শতাংশ জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রতি ইউনিটে ৫ টাকা খরচ পড়বে যা দেশের যে কোনো সৌরপ্রকল্পের থেকে কম বলে জানা যায়। অপ্রচলিত এবং নবীকরণ শক্তির অতিরিক্ত প্রধান সচিব এস আর মহান্তি বলেন, 'আমাদের প্রকল্প আগামী ১৫ আগস্ট, ২০১৬-তে উদ্বোধন হবে।' এছাড়াও এই প্রকল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে যার প্রতিটিতে উৎপাদন হবে ২৫০ মেগাওয়াট। তবে এই সৌরপ্রকল্পে ব্যবহৃত জমি প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক রাহুল জৈন বলেন, 'প্রকল্প গড়ে তুলতে যে জমি ব্যবহৃত হবে তা চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। যে সমস্ত জমি চাষের অযোগ্য সেই জমিতেই গড়ে তোলা হবে এই প্রকল্প।' আবার প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাড়পত্রের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে শ্রী মহান্তি জানান, 'সৌর প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো দূষণ পর্যদ নিগমের ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই।' রাজ্য সরকার— পি এস ইউ শক্তি বিকাশ নিগম এবং সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যে এজন্য একটি রিপোর্টও তৈরি হয়েছে।' তিনি শেষে আরও জানান, 'মধ্যপ্রদেশের মোট বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় ২০ শতাংশ এই প্রকল্প থেকেই উৎপাদন হবে।'

সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে কেন্দ্রের নয়া তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১২ ফেব্রুয়ারি দেশের সবকটি রাজ্যের রাজ্যপালদের নিয়ে দিল্লীতে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এদিনের সভায় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্যপালদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেওয়া হয় তা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মোকাবিলায় যা দেশের পক্ষে এক উদ্বেগজনক ঘটনা হিসাবে উঠে আসছে। কারণ দেশে যেভাবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী দলগুলি মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে তাতে দেশের নিরাপত্তা এক বড়সড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মাওবাদী সংগঠন এই সমস্ত জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত। তাই এদের ঠেকাতে একটি অর্থনৈতিক যোজনা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সরকার নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

সংশোধনী

স্বস্তিকার গত ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠায় প্রথম মহিলা রাজ্যপাল' শীর্ষক লেখাটির প্রথম লাইনটি পড়তে হবে এভাবে— সরোজিনী নাইডু ছিলেন দেশের (পশ্চিমবঙ্গের নয়) প্রথম মহিলা রাজ্যপাল। ওই লেখারই শেষের আগের অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে— নেহরুর আদর্শে...। পড়তে হবে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে...।

এছাড়া ৭ পৃষ্ঠার 'নির্মল গঙ্গা প্রকল্প নয়া উদ্যোগ কেন্দ্রের' শীর্ষক সংবাদে ১১ লাইনটি পড়তে হবে এভাবে— সঙ্গে নালা-নর্দমার আবর্জনা মুক্তকারী যন্ত্র (গাছ নয়)...

এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—সঃ স্বঃ

শুধু কথায় নয়, নির্ভয়ে হিন্দুদের সংগঠিত করার কাজ করতে হবে : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'সঙ্ঘের শক্তি হিন্দুসমাজ' যার মাধ্যমে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে। এরকম বড় সমাবেশের উদ্দেশ্য শক্তি প্রদর্শন নয়, আত্মদর্শন। এর ফলে অনুশাসন ও আত্মসংযম নির্মাণ হয়। আমরা জানি আমাদের দেশের সমৃদ্ধি আমাদেরই করতে হবে, দ্বিতীয় কেউ আমাদের ভাগ্য তৈরি করে দেবে না।' গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরপ্রদেশের কানপুর প্রান্তে আয়োজিত রাষ্ট্র রক্ষা সঙ্গমে স্বয়ংসেবকদের একথাগুলি বলেন

সমাবেশের একাংশ ও মোহনরাও ভাগবত।

সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। উল্লেখ্য, কানপুরের রেলওয়ে প্রাঙ্গণে আয়োজিত তিনদিনের শিবিরে ১১ হাজার স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ''সঙ্ঘের এই বিশাল আয়োজনকে বাইরের লোকেরা শক্তি প্রদর্শন করা বলে আখ্যা দেয়। কিন্তু যাদের শক্তি আছে তাদের প্রদর্শন করানোর প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশ কখনো দুর্বল ছিল না। কিন্তু আমাদের একতার অভাবে কিছু সংখ্যক লোক বাইরে থেকে এসে আমাদের পরাধীন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বার্থদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে আত্মীয়তার ভাবে সমাজ সংগঠন না করছি ততদিন আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সারা সমাজকে চরিত্রসম্পন্ন ও সংগঠিত করাই ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য মৌলিক কাজ। আমরা স্বয়ংসেবকরা নিরলসভাবে এই কাজে লেগে আছি।''

তিনি উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে। একেই হিন্দু সংস্কৃতি বলা হয়। আমরা সবাই নিজের বিশেষতা বজায় রেখে যদি একসঙ্গে মিলিত হই তাহলেই আমাদের দেশ পৃথিবীকে পথ দেখাতে পারবে। একসঙ্গে মিলিত হওয়ার শিক্ষাই আমরা সঙ্ঘের থেকে গ্রহণ করি। নিজে সংস্কারিত হওয়া সবচেয়ে বড় কথা।'

দেশের কিছু সংবাদপত্র সঙ্ঘের এই চিন্তন শিবিরকে দিল্লীর ভোটে বিজেপি-র পরাজয়ের জন্য পর্যালোচনা বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু খোদ সঙ্ঘের কানপুর প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ জানিয়েছেন, এটা তাঁদের পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম যা একবছর আগেই নিশ্চিত হয়ে রয়েছে।

অসমে পুরভোটে বিজেপি-র দারুণ সাফল্য

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা মেনে শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে বিজেপি। তারই সুস্পষ্ট চিত্র দেখা গেল অসমের পুরভোটে। রাজ্যের ৭৪টি পুরসভা ও নগর কমিটির ভোটে দারুণভাবে সাড়া পেয়েছে বিজেপি। ৭০২টি ওয়ার্ডের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে প্রায় অর্ধেক ৩৪০টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে বিজেপি। রাজ্য কংগ্রেস শাসিত। সেখানে কংগ্রেসের দখলে ২৩২টি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন ৩৮টি পুরসভায় বোর্ড গঠন করছে বিজেপি।

যে রাজ্যে কংগ্রেসের একচ্ছত্র দাপট ছিল সেখানে জনসমর্থন পেয়েছে বিজেপি ব্যাপকভাবে। গত নির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় স্থানে ছিল ৬৬টি আসন পেয়ে। প্রথমে ছিল কংগ্রেস, ৪২৫টি আসন তাদের দখলে ছিল। অসম গণ পরিষদ ছিল দ্বিতীয় স্থানে— ১০২টি। সিপিএম পেয়েছিল একটি। নির্দলরা ছিল ১০১টি। রাজধানীতে আম আদমি পার্টির জয়ের পর দেখা গেছে কংগ্রেস একেবারে কোণঠাসা। অসমে কংগ্রেস কোণঠাসা না হলেও বিজিপি-কে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে জনসমর্থন কমে যাওয়ায়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে বিজেপির থেকে কংগ্রেসের দূরত্ব অনেকটাই। কংগ্রেস এখন ১৭টা পুরসভায় ক্ষমতায় আছে। ২০০৯ সালে পেয়েছিল ৭১টি পুরসভা ও নগর কমিটি। সেবারে নির্বাচন হয়েছিল ৬৯৬টি ওয়ার্ডে।

বিজেপি-র অসম রাজ্য সভাপতি সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'অসম পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে বিজেপি-কে। অসমবাসী পরিবর্তনের পক্ষে জনমত জানিয়েছেন। কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে এই ভোটে। দিল্লীতে আম আদমি পার্টির জয়ের পর আমরা শিখেছি কীভাবে জনসমর্থন পেতে হয়। আমরা তা ব্যবহার করেছি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে আমরা এগোব আশাভরা মনোভাব নিয়ে। ২০১৬ সালের এপ্রিলে নির্বাচন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের পুরসভা নির্বাচনে ওইরকম ব্যাপক সাফল্যের জন্যে।

রেড করিডরের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের দুই অন্তিমপ্রান্তেই ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে রেড করিডর। উত্তরের দিকে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি এটি এখন উত্তর-পূর্বেও ঢুকতে শুরু করেছে। অন্যদিকে দেশের দক্ষিণপ্রান্তে কেরলের গভীর জঙ্গল এবং ম্যাঙ্গালোরের কিছু অংশে মাওবাদীরা তাদের প্রভাব বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। রেড করিডরের এই আড়ে- বহরে বৃদ্ধির দুঃসংবাদ নিঃসন্দেহে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে ভয়াবহ উদ্বেগের কারণ হবে। প্রসঙ্গত, মাওবাদীদের রেড করিডরের আওতাভুক্ত রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (বিদর্ভ), ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ। মোটামুটি এইসব প্রদেশের দুর্গম (এমনকী দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষেও) এলাকা-র দখল নিয়ে মাওবাদী কার্যকলাপের মুক্তাঞ্চলকেই রেড করিডর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মাওবাদীর একটা স্বপ্ন (সাধারণের কাছে তা অবশ্যই দুঃস্বপ্ন) রয়েছে যে নেপালের পশুপতিনাথ থেকে ভারতবর্ষের তিরুপতি পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার। এটা করতে গিয়েই রেড করিডরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বৃদ্ধি তাদের পক্ষে জরুরি বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

কেরল নকশাল আমলের পুরোনো ঘাঁটি হলেও উত্তর কেরলে মাওবাদীদের বাড়-বৃদ্ধি এতদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ইদানীং সেখানেও মাও-কার্যকলাপের খবর চোখে পড়ছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মতো শিল্প-সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোতে ক্রমশ ঘাঁটি গাড়ছে তারা। সবমিলিয়ে দেশের মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন তো আছেই, সেই সঙ্গে রেড করিডর বিস্তৃতির সৌজন্যে দেশের অর্থনীতিও এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জের মুখে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যদিও কেন্দ্র কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার কথা জানিয়েছে। তাঁরা মনে করছেন ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে মাওবাদীরা শোচনীয় পরাজয়ের পরেই কেরলের দিকে হাত বাড়িয়েছে। কেরল এমনিতেই মুসলমান ভয়ের শিকার (প্রেম জেহাদ সহ বিভিন্ন ভাবে)। এখন রাহু-কেতুর মিলনের মতো ইসলামি সন্ত্রাসের সঙ্গে নকশালরা মিললে পরিস্থিতি কতটা বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। গত বছর সাপ্তাহিক মাতৃভূমি পত্রিকায় আন্ডারগ্রাউন্ড মাও-নেতা রূপেশ বারংবার নির্দেশ করেছিল যে মাওয়েরা পশ্চিমঘাট বিশেষ জোনাল কমিটি গঠন করে কেরল কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বনাঞ্চল জংশন এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে।

রেড করিডর : পরিসংখ্যান একনজরে

মাও প্রভাবিত জেলা—	২০০
মাও প্রভাবিত রাজ্য—	১৭
সর্বমোট নিহতের সংখ্যা—	১২,১৮৩
নিহত নাগরিক—	৯৪৭১
কেন্দ্র ও রাজ্য নিরাপত্তারক্ষী নিহত—	২৭১২

গোয়েন্দা সূত্র বলছে, মাওবাদীরা গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেছে। এ বিষয়ে কাউন্টার টেররিজম বিশ্লেষক অনিল কম্বোজের বক্তব্য : ‘মাওবাদীরা আমাদের রাজ্য-পুলিশগুলোর মতো আন্ত-রাজ্য সীমারেখা মানে না। সুতরাং এক রাজ্যে তার চাপ বুঝলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গা ঢাকা দেয়। এটা প্রায় ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং এই পথে তারা তাদের সীমানা ক্রমশ প্রসারিত করছে। ছত্তিশগড় বেশ কয়েক দশক যাবৎ-ই মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। ২০০৮-এ বস্তারে বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু। সাম্প্রতিক ঘটনা বলতে গত বছর সুকমায় বিস্ফোরণ।

মধ্যবর্তী এই অর্ধযুগে মাওবাদীরা নিশানা করেছে মূলত নিরাপত্তারক্ষীদের। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক নেতারাও তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। রেড করিডর প্রশস্ত করতে এধরনের হিংসা ছড়ানো মাওবাদীদের বর্তমানে অন্যতম লক্ষ্য বলে অনেকেই মনে করছেন।

এই একই লক্ষ্যে ভারত-বিরোধী বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গেও হাত মেলাচ্ছে তারা। উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকার পরে অসমে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব্ অসম (উলফা) এবং মণিপুর পিপলস্ লিবারেশন আর্মি (পি এল এ)-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে তারা। এর ফলে অস্ত্র-শস্ত্র জোগানে মাওদের বিশেষ সুবিধে হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সমুদ্র-উপকূল থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার-ই আপাতত তাদের লক্ষ্য বলে গোয়েন্দাসূত্রে খবর। শ্রীলঙ্কায় নিজস্ব ভিত্তি স্থাপন করা চীনে চোরাকারবারীদের কাছ থেকেও ভারতের মাওবাদীদের কাছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আসছে বলে গোয়েন্দা- সূত্রের খবর।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের উদ্বিগ্ন করেছে শুধু ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই নয়, বিদেশের ভারত-বিরোধী শক্তিরও মদত পাচ্ছে মাওবাদীরা। তবে স্বস্তির কথা একটাই। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে কোনোভাবেই নরম মনোভাব দেখাচ্ছে না। বরং কড়া হাতে মাও দমনের কথা ঘোষণা করেছে। ■

হিন্দুত্ব বিজেপির পরাজয়ের কারণ নয়, বরং সম্পদ : ভি এইচ পি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লীতে বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র ধরাশায়ী হওয়ার কারণ হিসেবে যারা কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচনা করছেন তাদের মুখের মতো জবাব দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদের বক্তব্য, নির্বাচনে হিন্দুত্বের যদি কোনো ভূমিকা থাকে তবে তা দলের কাছে সম্পদ। সম্প্রতি ভি এইচ পি-র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন বলেছেন, যখন এন ডি এ কেন্দ্রে প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল, তখন লোকে বলেছিল হিন্দুত্বের ঢেউয়ের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন তারাই আবার হঠাৎ বলতে শুরু করেছে, হিন্দুত্বের জন্যই নাকি এই পরাজয়।

সুরেন্দ্র জৈন

শ্রী জৈন আরও বলেন, এবারে দিল্লীর বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হার দেখুন। গত বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারেও বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের হার প্রায় একই রকম আছে। গত ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৩৩.১ শতাংশ আর ২০১৫-তে তা হয়েছে ৩২.২ শতাংশ। এটা কি, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লীর মোট সাতটি আসনের ৭টিতেই বিজেপিই জয়ী হয়েছিল এবং প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৬.৪ শতাংশ।

শ্রী জৈন-এর বক্তব্য, পরিষদ 'লাভ জেহাদ'-এর প্রতিবাদ বরাবর করে আসছে। আর সেই ১৯৬৬ সাল থেকে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 'ঘর বাপসী' অর্থাৎ স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। এটা আমরা এই প্রথম শুরু করলাম এমন নয়। এখন সেকুলার মিডিয়া ও বিরোধীরা এনডিএ-কে কোণঠাসা করতে এটা নিয়ে হৈ-হুল্লা শুরু করেছে।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাও থেকে বিজেপি-র চারবার জয়ী সাংসদ সাক্ষী মহারাজ বলেছেন, 'আমি মনে করি না যে আমার মন্তব্য দিল্লীর ভোটে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'দিল্লী নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাক্ষী মহারাজের মন্তব্য (প্রতিটি হিন্দু নারীর চার সন্তানের মা হওয়া প্রয়োজন), নিরঞ্জন জ্যোতি-র 'হারামজাদা' মন্তব্য, না দলীয় কার্যকর্তা ও কর্মীদের অসন্তোষের মধ্যে কোনটি দায়ী তা খতিয়ে দেখতে হবে। শ্রী সাক্ষী মহারাজ বলেছেন, আমার মন্তব্যই যদি হারের কারণ হোত তবে বিপুল ভোটে আমি চার চারবার নির্বাচনে জয়ী হলাম কীভাবে?

দেশ জুড়ে যোগদিবস পালনের এক বিশাল পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছাত্র, শিক্ষক, সেনা, কূটনীতিবিদ সকলেই আগামী 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব যোগদিবস' ২১ জুন, রবিবারে ৩০ মিনিট যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সহায়তা করে বিশ্বকে এক 'প্রেরণার বার্তা' দেবে। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের আয়ুষ (Ayush) মন্ত্রকের একটি বৈঠকে স্থির হয়েছে যে আন্তর্জাতিক যোগদিবস দেশের ১৩ লক্ষ সরকারি বিদ্যালয়, ৩২ হাজার কলেজ ও ৭০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হবে। সরকারি কর্মচারিরাও এদিন কাজে যোগ দেবেন, যদিও দিনটি রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিন। এটা

তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কিনা তা অবশ্য ঠিক হয়নি। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৩০টি দেশ ভারতের অনুরোধ মেনে আগামী ২১ জুন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব যোগদিবস' হিসেবে পালন করবে বলে স্থির করেছে।

গত ২৮ জানুয়ারি এন সি সি (ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর)-এর এক সমাবেশে শ্রী মোদী ক্যাডেটদের উদ্দেশে আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালনের জন্য এমন একটি চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করার কথা বলেন যা রেকর্ড সৃষ্টিকারী ঘটনা হয়ে থাকবে ও সেইসঙ্গে সারা বিশ্বের কাছে এক প্রেরণাদায়ী বার্তা পাঠাবে। যোগের আবিষ্কর্তা হিসেবে আমাদের দেশ বিশ্বকে এটা জানাতে চায় যে যোগ মানবজাতির ভারসাম্য রক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী উপাদান।

মোদী ভারত চালান, বাংলা একাই চলবে

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭ নম্বর রেসকোর্স, নয়াদিল্লী

আপনাকে অভিনন্দন। স্বাধীনতার পর থেকে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বপ্ন ভারত দেখে আসছে তা পূর্ণ করার পথে আপনি পদক্ষেপ করেছেন। পরাধীনতা-মুক্ত ভারত জন্মাবধি নামের সঙ্গে 'যুক্তরাষ্ট্র' কথাটা জুড়ে রেখেছে। কিন্তু সত্যিই কি তার বাস্তবায়ন হয়েছে। এতকাল কেন্দ্র তার ইচ্ছামতো রাজ্যের ঘাড়ে প্রকল্প চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। নিজেই ঠিক করে দিয়েছে সেই প্রকল্পে কত টাকা খরচ করা যাবে। কোন পথে কাজ করবে প্রকল্প ইত্যাদি। হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান হয় না তেমন প্রতিটি রাজ্যের প্রয়োজনও আলাদা। বাংলায় যেমন দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। ফলে সেই এলাকার মানুষের জন্য এমন কিছু কাজ করা দরকার যেটা অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে ওই সব এলাকায় মানুষের দারিদ্র্য কমানোর মতো কোনও পরিকল্পনা নিতে পারলে হয়তো অনেক অসাধু ব্যবসা বন্ধ করা যেত। রাজ্যের অনেক সমস্যাই কমিয়ে ফেলা যেত। এমনকী জঙ্গি হামলার ভয় থেকেও মুক্ত হতে পারত ভারত। এমন প্রকল্প আনাই যেতে পারে যাতে ভারতের সীমান্ত এলাকায় বসবাস করবেন শুধু দেশপ্রেমীরা। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি আরও একটা সুরক্ষা বলয়। যেটা আরও শক্তিশালী।

যাই হোক, সেসব ভেবে কী হবে? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন, বাংলা ওসব মিটিং ফিটিংয়ে নেই। রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা প্রকল্প মানেই চাপ। প্রথমত মাথা ঘামিয়ে সেটা বলতে হবে। বোঝাতে হবে। টাকা নিতে হবে। কাজও করে দেখাতে হবে। না পারলে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপানো যাবে না। আর বহুদিনের প্রিয় স্লোগান, 'কেন্দ্রের বঞ্চনা' বলে বাজার গরম করা যাবে না। সুতরাং নো মিটিং, নো সিটিং, অনলি ইটিং। এই ইটিং মানে কিন্তু টাকা খাওয়া ভাববেন না। প্রকল্পের টাকা খাওয়ার দরকার পড়ে না, আমাদের শাসকদলকে টাকা খাওয়ানোর মতো অনেক গৌরী সেন আছেন এই বাংলায়।

যাই হোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে সবাই এক বাক্যে বলছে যে এই প্রথম ভারতকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় করার কাজ শুরু হয়েছে। এখন থেকে কোন রাজ্য কোন ধরনের প্রকল্প চায় তা শুনে বিবেচনা করে সেই মতো অর্থ বরাদ্দ করা হবে। গোটা দেশের জন্য এক প্রকল্প আর নয়। পুরাতন যোজনা কমিশনের জায়গায় সময়োপযোগী 'নীতি' আয়োগের এটাই হবে লক্ষ্য।

যে রাজ্যের কৃষি ক্ষমতা বেশি সে কৃষিতে উন্নতি করুক। যার প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি সে সেই পথেই এগিয়ে চলুক। কেউ পর্যটন, কেউ শিল্প, কেউ বন্দরকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠতেই পারে। সেটা যে সম্ভব তা প্রাকৃতিক সম্পদে বঞ্চিত গুজরাট বা কেরল আগেই দেখিয়ে দিয়েছে। এর ফলে প্রতিটি রাজ্য তার রাজস্ব আয়ও বাড়াতে পারবে। সব সময় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। আর রাজ্যের আয়তন, জনসংখ্যা, প্রকল্পের খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করেই যেহেতু অর্থ বরাদ্দ হবে সেহেতু বঞ্চনার প্রশ্নই থাকবে না। বরং রাজ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে উন্নয়নের। নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পের। গোটা ভারত এগোবে কিন্তু যে যার নিজের মতো করে। মুড়ি-মিছরি এক দর হবে না। ভেবেছেন ভালো, তবে বাংলাকে নিয়ে অত ভাবতে হবে না।

স্বাধীন ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস বলছে, যখন যিনি রেলমন্ত্রী হয়েছেন তখন তিনি নিজের রাজ্যকে ঢেলে দিয়েছেন। অনেক সময় এত দিয়েছেন যে উপচে পড়েছে। অবাস্তব প্রকল্পে শিলান্যাস হয়েছে, ঘটা হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি। তবে ভোট বৈতরণী পার হওয়া গেছে। এই রাজ্যের তার অনেক উপমা। একথা মানতেই হবে ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসার জন্য তৃণমূলনেত্রীকে অনেকটাই সাহায্য করেছে সেই সময় রেলমন্ত্রক নিজের হাতে থাকাটা। সুদীপ্ত সেন থেকে শুভাপ্রসন্নদের খুশি করার জন্য রেল চলেছে কু-ঝিক-ঝিক করে।

এবার রেল বাজেটের আগে ফের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার সরকার প্রতিটি রাজ্যের কাছে চাহিদা জানতে চেয়েছে। এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত সব রাজ্য নিজেদের দাবিদাওয়া জানালেও বাংলার ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে আটকে আছে বলে খবরের কাগজ পড়ে জানলাম। অতএব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝতেই পারছেন বাংলা একাই চলবে। আপনি দেশ চালান।

তিনি বিশ্বকবি হলেও বাংলার। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। এটা আবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয়। তিনি তাই কেউ ডাকলেও একলা চলো রে'। এটা আবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয়। তিনি তাই কেউ ডাকলেও একলা চলতে চান। আর বঙ্গবাসীর কথা ভাবছেন! ভাববেন না। তাঁকে যারা জিতিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছে তাদের ভুল তাদেরই বুঝতে দিন। ভুলই বা কেন হয়তো এটাই ঠিক। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনেও যেভাবে দিদির দল স্বমহিমায় তাতে বোঝা বঙ্গবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠের সায় দিদি একলা চলতেই।

—সুন্দর মৌলিক

অপরীক্ষিতের আকর্ষণ

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

অজানাকে জানার, অপরীক্ষিতকে পরীক্ষা করে দেখার নেশা মানুষের মজ্জাগত। কোনো দেশে, কোনো কালে মানুষ এই নেশার হাত থেকে রেহাই পায়নি। আর নতুনের প্রতি আকর্ষণ তো এককথায় মানুষের বেঁচে থাকার রসদ বলা যায়। রাজনীতিবিদ্ থেকে চিন্তাবিদ্, গণমাধ্যম থেকে সমীক্ষক সংস্থা—সবার হিসেব-নিকেশকে উল্টে দিয়ে আম আদমি পার্টি (আপ)-র সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক দিল্লী বিজয়কে শেষমেশ এভাবেই ব্যাখ্যা করতে হয়।

জনতার ভাবাবেগ যদি রাজনীতির মূল উপজীব্য হয়, তবে সদ্য ক্ষমতা দখলকারী একটি দল এই ভাবাবেগকে সঠিকভাবে পড়তে পেরেছে একথা বললে ভুল বলা হবে না। সেই কারণে, বিজেপি যে দিল্লীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে ভুল করেছে এই যুক্তি একেবারেই ধোপে টেকে না।২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং মাত্র ন' মাস আগেও লোকসভা নির্বাচনে যেখানে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, সেখানেই আজ তারা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি! অনেকে তাই 'কেন্দ্রে মোদী, রাজ্যে কেজরি'—জনগণের এই মনোভাবের তত্ত্ব চালাতে চাইছেন। এই সূক্ষ্ম ফারাকটা যদি 'আম আদমি' বুঝে থাকেন, তবে তাঁদের এটাও বোঝা উচিত যে দিল্লীর ভাগ্যবিধাতা তো কেন্দ্র সরকারই। তাই বিজেপির বদলে আপকে দিল্লীবাসীর পছন্দের তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে খাড়া করা যায় না। অরবিন্দসাহেব আবার বলছেন যে অহঙ্কারই নাকি বিজেপির বিপর্যয়ের কারণ। আত্মম্ভরি ও অহঙ্কারী হিসেবে খোদ তাঁরই যথেষ্ট দুর্নাম রয়েছে। তাঁর ব্যবহারে একসময় তাঁরই ছায়াসঙ্গীরা এক এক করে আপ ছেড়েছেন, প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। বিজেপির আত্মতুষ্টি এবং নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার একটা ব্যাখ্যা হয়তো দেওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর আত্মম্ভরিতার কারণ কি ছিল?

তাই আম জনতা বিজেপির অহঙ্কারকে মেনে নিতে পারেননি, আর তাঁর দম্ভকে স্বীকার করে নিয়েছেন—এ যুক্তি কি আদৌ সর্বজনগ্রাহ্য?

আরও অবাক করা তত্ত্ব হল যে বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিপূরণে ব্যর্থ, একথা বিচার হবে তো পাঁচ বছর পর। এই জনতাই আবার পনেরো বছর সময় নিয়েছিলেন এটা বুঝতে যে কংগ্রেস শাসিত সরকার দিয়ে দিল্লীবাসীর কোনও উপকার হবে না!

অসংখ্য সাফল্যের মাঝে মাত্র একটা ব্যর্থতা দিয়ে একথা প্রমাণ হয় কি যে বিজেপির জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েছে? এত বিপুল 'ঝাড়ু ঝড়ে' বিজেপির ভোটবাক্সকে তেমন একটা টলানো যায়নি। কেজরিওয়ালের খুব ছোট রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে তাঁর বিচক্ষণতার লেশমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদিকে তিনি নিজেকে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) বলে যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর সাফল্যে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ নিয়ে তাঁর নিজের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যে রাজনীতিকটি কিছু অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে মাত্র ৪৯ দিনের মাথায় নিজের দেওয়া মিথ্যে প্রতিশ্রুতির চাপে সরকার ভেঙে দিলেন, তিনিই আবার রাজ্যরাজনীতিকে পেছনে ফেলে লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে গোহারা হেরে বসলেন। আবার তিনিই আগের চেয়ে বেশি কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে গেলেন! সত্যিই এমন কেউ আছেন যিনি বলবেন যে কেজরিসাহেব ক্ষমতালোভী বা আত্মপ্রচার সর্বস্ব নন? বাংলার মমতাদেবীর মতো তিনিও আদ্যোপান্ত ক্ষমতালোভী মানুষ যিনি নিজেই জানেনা যে তিনি ঠিক কি করতে চান। আর ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে তিনি কোনোরকম ন্যায়-নীতির ধার ধারেন না। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-র যে খেলা তিনি খেলে আসছিলেন তাতে শেষমেশ ফেঁসে গেলেন বলা যায়।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিজেপি তার নীতি বিসর্জন দিয়ে ২০১৩ সালে দিল্লীতে সরকার গড়েনি। তিনি কিন্তু যাদের দুর্নীতিকে তোপ দেগে ভালো ফল করলেন, তাদের নিয়ে সরকার গড়েন। আবার গরিষ্ঠতার অভাবে কাজ করতে পারছেন না এ অজুহাতে ইস্তফা দিতেও দু'বার ভাবেননি। এবার সে সুযোগ তাঁর আর রইল না। আর জনতাকে অসম্ভব কিছু পাইয়ে দেবার যে প্রলোভন তিনি দেখিয়েছেন, তাতে তিনি পালিয়ে যেতে চাইলেও জনতা তাঁকে খুঁজে নেবে। বিগত কয়েক দশক ধরে রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। এঁদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক পুঁজি হলো কেন্দ্র বিরোধিতা ও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অচিরেই এঁদের অন্তঃসারশূন্যতা ও দুর্নীতিতে রাজ্যবাসী চূড়ান্ত হতাশ হয়েছেন। অনেক রাজ্যে এটা পরীক্ষিত হলেও দিল্লীবাসী এযাবৎ সে সুযোগ পান নি। এবার তার পালা শুরু হল। গড়পড়তার নিয়ম (law of average) মেনে বিজেপির লাভ বৈ ক্ষতি হয়নি। এতে অল্পসময়েই যেমন আপের মুখোশ খুলে যাবার সম্ভাবনা রইল, তেমনি আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনগুলির আগে বিজেপির পক্ষে তার সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঝালিয়ে নেবার সুযোগ থাকল। নানা সূত্র থেকে আবার কানাঘুষোও শোনা যাচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদী সুকৌশলে 'আপের মাথায় প্রতিশ্রুতির ডালি' তুলে দিলেন। ■

গঙ্গাদূষণ : প্রতিরোধের প্রচেষ্টা

সুনির্মল চন্দ

পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষে মাতৃরূপে পূজিতা। ভারত সভ্যতার দিক নির্ণয়ে গঙ্গানদীর স্থান আদিকাল থেকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ থেকে গঙ্গা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। গঙ্গার জলকে পানীয় হিসাবে, কৃষিকাজে, নদীপথে যাতায়াতের জন্য সেই আদিযুগ থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার জন্য ভারতীয় জনগণের মানসিকতা গঙ্গার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। জনমানস এই নদীকে ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে দেবতা হিসেবে, এমনকী মাতৃরূপে পুজোও করেছে। মানুষের শ্রদ্ধাশীল অনুভূতি এতই গভীর যে শিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে না যে গঙ্গাজল কখনো মনুষ্যকৃত অবহেলায় অপবিত্র বা দূষিত হতে পারে। (লোকসভায় গৃহীত উদ্ধৃতি, জুন, ১৯৮০)। এখন গঙ্গার বিশাল জলরাশির ধারা কিন্তু ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, যখন বৃষ্টির জলে নদী পুষ্ট হয় না।

ভারতের অর্থিক, সামাজিক, এমনকী রাজনৈতিক জীবনে গঙ্গানদীর তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম। ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জীবন ধারণের এবং জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থাৎ প্রায় ৩৭ শতাংশ মানুষ গঙ্গার ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে গঙ্গাকে ভারতীয় জীবনধারার মূর্ত প্রতীক বলে মনে করা হয়। সমগ্র দেশের মোট সেচ-সেবিত অঞ্চলের ৪০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল সেচের জন্য এই নদীর অববাহিকার জল ব্যবহার করে।

দূষণ সমস্যাতে এখন গঙ্গার বর্তমান অবস্থা কি? সেই জল এখন আর বৈদিক যুগের পূত পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত নয়। যুগ যুগ ধরে আধুনিক মানুষের নির্লিপ্ততায় এবং অত্যুগ্র লোভে গঙ্গা আজ অভিশপ্ত, অপবিত্র। অপবিত্রতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কতগুলো গোড়ার কথা জানতে হবে। বিশেষ করে বর্ষার সময় গঙ্গা অববাহিকায় দুর্বার জলস্রোতের সৃষ্টি হয় যা কিনা তীরবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করে নদীর জলের সঙ্গে মেশে, সঙ্গে নিয়ে আসে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ, যেমন জৈব এবং অজৈব সারের অনেকাংশ, সঙ্গে থাকে কীটনাশক ঔষধের মাত্রাবিশেষ, আর থাকে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানা দূষণকারী দ্রব্য। এতসব বাঞ্ছনীয় এবং অবাঞ্ছনীয় পদার্থ, সঙ্গে থাকে গ্রাম্য কাজে নিয়োজিত নানা বস্তু, যেমন গবাদিপশু থেকে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থ নদীর জলকে ভারাক্রান্ত করে। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় মাটির ছোট ছোট ফাটল দিয়ে এই দ্রব্যাদি মাটির ওপরের স্তরের মাটির পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করে নদীর জলের সঙ্গে মেশে এবং ধাবমান জলপ্রবাহকে দূষিত করে। এছাড়া আরও একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমধিক বিচার করা উচিত, যেমন গ্রামীণ মানুষের যথেচ্ছ এবং যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ এবং নির্বিচারে নদীর

জলে স্নান, বস্ত্র প্রক্ষালন, হাজার হাজার লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ, বিশেষ করে যখন কোনও বৃহৎ ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান হয়। তার ফলে ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত জল নানাবিধ রোগের কারণ হয়।

আমাদের দৃষ্টি যদি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গার অর্থাৎ ভাগীরথী বা হুগলীর ওপর নিক্ষেপ করি, তাহলে সমীক্ষায় আমরা যে ফলাফল পেয়েছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করছি।

গঙ্গার মূল উৎস থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত নদীর ওপর যে অবিশ্রান্ত অত্যাচার হচ্ছে তার একটি সমীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কারণগুলো নির্ণয় করা যায় :

১। নদীতীরবর্তী জনপদগুলো (শহর এবং গ্রাম) থেকে বহির্গত দূষিত জল নালা, খাল, বিল নিচু এলাকা দিয়ে বাহিত হয়ে গঙ্গার জলের সঙ্গে মেশে। সমীক্ষা অনুযায়ী আনুমানিক ১৩৪ কোটি লিটার দূষিত জল জনপদগুলি থেকে নির্গত হয়ে নদীর জলের সঙ্গে মেশে।

২। নদীতে বা নদীর তীরে মানব সম্প্রদায় যে আবর্জনা সঞ্চিত করে, সেটাও বৃষ্টির জলে বা অন্যান্য উপায়ে ধৌত হয়ে নদীর জলকে দূষিত করে।

৩। নদীর তীরে অসংখ্য শিল্প এবং কল-কারখানায় ব্যবহৃত জল নর্দমা দিয়ে নদীতে মেশে। ফলত এই জলে প্রভূত পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যেমন সীসা, দস্তা, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, পারদ, ক্লোরাইড, সালফেট,ফসফেট, নিকেল, আর্সেনিক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। নদী ছাড়াও এগুলি হ্রদ বা পুকুর প্রভৃতি নানা জলাশয়কে বিপজ্জনক মাত্রায় বিষাক্ত করে তোলে।

৪। চাষের কাজে লাগে এমন সমস্ত কীটনাশক বা রোগনাশক রাসায়নিক ওষুধ জলবাহিত হয়ে নদীর জলে মেশে।

৫। জীবজন্তুর মরা পচা দেহাবশেষ এমনকী মানুষের অর্ধগলিত শবদেহের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলা হয় এবং তাতে জল দূষণের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়।

৬। গঙ্গাতীরে মানুষ প্রতি নিয়ত নির্বিচারে মলমূত্র ত্যাগ করার ফলে জল দূষিত হয়ই, তাছাড়া জলে রোগ জীবাণুর মাত্রা বাড়ায়। বিশেষ করে নানাধরনের কৃমি জাতীয় জীবাণু পেটের অনিষ্ট করে এবং সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করে।

গঙ্গার দূষণ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যখন ভারতবর্ষে প্রথম শিল্প সংস্থাগুলো গড়ে ওঠে, সেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা। যেমন হুগলীর রিষড়াতে সর্বপ্রথম চটকল গড়ে ওঠে। তারপর ক্রমশ নদীতীরে একটির পর একটি চটকল এবং অন্যান্য শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই এই সমস্ত কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঘিঞ্জি বসতির পত্তন হয়। যেমন শ্রীরামপুর, চন্দননগর, আজিমগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি ব্যবসায়িক, শিল্পকেন্দ্রিক শহর ও শহরতলি গড়ে ওঠেছে। ফলে দৈনিক ব্যাপক সংখ্যক মনুষ্য সমাগমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপ অনিবার্যভাবে গঙ্গার ওপর এসে পড়ে। বহু শহর গঙ্গার দুই কূলে অবস্থান করার ফলে গুণিতক হারে ক্রমবর্ধমান দূষণের ভারে গঙ্গা মলিন থেকে মলিনতর হয়েছে।

ভারতবর্ষের মোট শহরের এক চতুর্থাংশ শহর গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। ভারতবাসীর জীবনে গঙ্গার তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং সাম্প্রতিককালে গঙ্গা এবং গঙ্গার জলে যেভাবে দূষিত হচ্ছে তা নিরসনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, New Delhi) এ বিষয়ে গঙ্গা অববাহিকায় একটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষা থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করা হয়, তার ভিত্তিতে 'গঙ্গাদূষণ রোধ প্রকল্প' (Ganga Action Plan) সম্পর্কে একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৮৫-র ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় গঙ্গা কর্তৃপক্ষ (Ganga Authority) গঠন করে। উদ্দেশ্য মেয়াদভিত্তিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ

শহরে বি.ও.ডি. (বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)*
স্থান শহুরে এলাকার বি.ও.ডি. (কিলোগ্রাম দৈনিক)

স্থান	গার্হস্থ্যঘটিত	শিল্পঘটিত	মোট
ব্যারাকপুর (মেইন)	১,৭২৫	২৩৩	১,৯৫৮
ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট	৬৭৭	—	৬৭৭
নিউ ব্যারাকপুর	৭৭৫	—	৭৭৫
উত্তর ব্যারাকপুর	১,৬৬৬	—	১,৬৬৬
ইছাপুর ডিফেন্স কলোনি	৩১৩	১০০	৪১৩
পানপুর	৯৪	—	১৪
গাড়ুলিয়া (মেইন)	৯১৭	২২,০৫১	২২,৯৬৮
মাদ্রাইল ফিংগাপাড়া	১৫৫	—	১৫৫
নারায়ণপুর	৫২	—	৫২
ভাটপাড়া (মেইন)	৮,১৭২	২৩,৭১৯	৩১,৮৯১
গবেষণা এলাকার মোট পরিমাণ	**১৪,৫৪৬**	**৪৬,১০৩**	**৬০,৬৪৯**
২৪ গরগনা জেলা (অতিরিক্ত)	**৭৭,৪৯৪**	**৬৭,১০৪**	**১,৪৪,৫৯৮**

* গঙ্গা বেসিন দূষণ সার্ভে (১৯৭৬-৭৭)

এবং তার রূপায়ণ। অন্যতম উদ্দেশ্য হল গঙ্গা তীরের ভাঙন রোধ এবং নদীর জলের দূষণমাত্রা যথাসম্ভব হ্রাস করা। ১৯৮৬-র ১৪ জুন ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বারাণসীতে গঙ্গাদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

এর মধ্যে ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কর্তৃপক্ষ একেবারে গোড়ায় জানিয়েছিলেন আজ থেকে পাঁচ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৫ বৎসরের মাথায় এই কর্মযজ্ঞের সমাপ্তি হবে। কিন্তু ২০ বৎসর বাদে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে ১৫১.৭০ কোটি টাকা। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার প্রক্রিয়ার এখনো অনেক বাকি। দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি) জানিয়েছে অধিকাংশ কাজই এখনও বাকি।

প্রাথমিক পর্যায়ে আজ থেকে ২০ বৎসর গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ আরম্ভ হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের ২০টি শহরকে কেন্দ্র করে। দুঃখের বিষয় এখনও দুই- তৃতীয়াংশ দূষণ মাত্রা বিদ্যমান।

সমীক্ষায় জানা গেছে এই দীর্ঘ ২০ বৎসরে দূষণমুক্ত করার যন্ত্র, শবদাহ করা বৈদ্যুতিক চুল্লী ইত্যাদি বিভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমিশনের প্রতিবেদন সন্দেহ প্রকাশ করেছে এইসব যন্ত্রপাতির অধিকাংশই এখন আর কর্মক্ষম নয়। কমিশন একটি বেসরকারি এবং স্বাধীন সংস্থা দ্বারা এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করার মত প্রকাশ করেছে। (দি স্টেটসম্যানের প্রতিবেদন, ১৫.৪.২০০৫)।

পশ্চিমবঙ্গের সমীক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশগত অবস্থা

আমাদের সমীক্ষাগত দৃষ্টি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নিক্ষেপ ও একটু বিচার করে দেখা যাক তার ছবিটি কেমন দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের নদীতীরবর্তী শিল্প-প্রধান অঞ্চল প্রসারিত হয়েছে ২৪ পরগনার ভাটপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত। এই শিল্প

সংস্থাগুলোর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো বস্ত্রশিল্প, রসায়ন শিল্প, লৌহ বা ধাতব শিল্প, কাগজ শিল্প এবং সিমেন্ট শিল্প। এইসব শিল্প-কারখানা থেকে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা ছাড়াই প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। এ ছাড়াও এই অঞ্চল জুড়ে ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর, গাড়ুলিয়া ও ভাটপাড়া পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ও নর্দমা রয়েছে, সে সবের মাধ্যমেও প্রচুর দূষিত পদার্থ গঙ্গার জলে মেশে। এর ফলে গঙ্গার জল ভয়াবহ পরিমাণে দূষিত হয়ে উঠেছে বা উঠছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং দূষণ সমস্যা যে কত গভীর তা অবশ্যই প্রতিভাত হয়।

সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে অবিভক্ত ২৪ পরগনার একটি ক্ষুদ্র এলাকায় মাত্র ১০টি শহরতলির দৈনিক বি. ও. ডি. (বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)-র পরিমাণ ৬০,৩৪৯ কেজি। দ্রষ্টব্য হোল ২৪ পরগনার গাঙ্গেয় এলাকার মোট বি. ও. ডি. যখন দৈনিক ১,৪৪,৫৯৮ কেজি, তখন কেবল ভাটপাড়া শহরের বি. ও. ডি. হোল দৈনিক ৩১,৮৯১ কেজি অর্থাৎ দৈনিক ২২, ০৫ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য, এই অঞ্চলে যে অসংখ্য গ্রাম, জনবসতি এবং কৃষিক্ষেত্র রয়েছে, তাতে সার এবং যে সকল কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, সেসব তো বটেই, তার সঙ্গে আরও অনেক দূষিত পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুয়ে অথবা নর্দমা বেয়ে নদীর জলে মেশে। ফলে এই অঞ্চলের নদীজলের দূষণ মাত্রা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুগলীনদীর দূষণমাত্রা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে পলতা জলশোধন কেন্দ্র থেকে জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে (Ganga Project Directorate) ওখানকার জল পানযোগ্য কিনা। তার ফলাফল ও জলের উপাদান সমূহের সহনশীলতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে পলতার কাছে গঙ্গার জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড এবং সালফেট, সহনশীল মাত্রার চাইতে অনেক কম। আবার কোলিফরমের মাত্রা

বিপজ্জনক হারে বেশি। ফিকাল কোলিফরম জলে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। জল-বাহিত নানা রোগের অন্যতম মূল কারণ হলো কোলিফরম ব্যাক্টেরিয়া, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৯০ সালে পলতার কাছে গঙ্গার জলের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে পলতার কাছে গঙ্গার জলে মোট কোলিফরমের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার ১৮৪ গুণ বেশি। অন্যান্য দূষণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোলিফরমের মাত্রা। এর থেকে প্রমাণ হয় গঙ্গার জল স্নানের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসের সমীক্ষার সময় (Centre for Study of Man of Environment) বিভিন্ন এলাকার জলাশয় এবং গঙ্গার জলের নমুনা থেকে যে উপাদানগুলো সংগৃহীত হয়েছে তাতে কোলিফরম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি যথার্থই উদ্বেগের কারণ। সেটি কোলিফরম এবং ফিকাশ কোলিফরম-এর মাত্রা সহনশীলতার মাত্রাকে অনেক গুণে অতিক্রম করেছে। এর থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় এই অঞ্চলের গঙ্গার জল স্নান এবং পানের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং অতিশয় ক্ষতিকারক। তার সঙ্গে রয়েছে তেল ও গ্রীজের (grease) উপস্থিতি। একটু লক্ষ্য করলে খালি চোখে দেখা যায় গঙ্গার জলে অনেক জায়গায় তেলের আস্তরণ ভাসে। জলস্থিত মৎস্যকুলের পক্ষেও এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। গঙ্গা থেকে মৎস্য সরবরাহের অপ্রতুলতা শুধু জল দূষণের ফলে নয়, তেলও একটি প্রধান কারণ।

গঙ্গা তীরবর্তী জলাশয়গুলির জলের নমুনা সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে পুকুরের জলেও তেল ও গ্রীজের উদ্বেগজনক উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও নিকেল ও ম্যাঙ্গানিজের মতো ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা মানব শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

গঙ্গা জলের পুনর্মূল্যায়ন

গঙ্গানদীর জলের দূষণের মাত্রা নির্মূল করা, তীরের ভাঙন ও ক্ষয়রোধ করার উদ্দেশ্যে যে গঙ্গাদূষণ রোধ পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাতে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা মূল্যের ২৬২টি প্রজেক্ট বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেমন মৃতদেহ সৎকারের জল বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপন, (Electric Crematariun), সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লাট (Treatment Plant) গঠন, স্বল্প খরচে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সৃষ্টি, বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে যেসব জায়গায় তীর ভাঙনের প্রভাব উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সেসব জায়গায় তীর মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায় দূষণমাত্রা পরিমাপ করার মতো বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে এই পরিকল্পনায় সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে। সেটা হলো গঙ্গাদূষণ রোধ পরিকল্পনার নামে যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে সামাজিক পরিকল্পনার দিকটিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারণের দৈনন্দিন মান উন্নত করা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা। দুঃখের বিষয়, এই পরিকল্পনার সঙ্গে মানুষের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণের বিষয়ে ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফলে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা তেমনভাবে পরোক্ষ অংশগ্রহণ যে ফলপ্রসূ হবে না, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। (১৫.৪. ২০০৫ তারিখে 'দি স্টেটসম্যান'-এর প্রতিবেদন)

এই পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার তীরবর্তী মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর কর্তব্য :

১। নদীতে কোনোরকম আবর্জনা না ফেলা।

২। নদীতে শ্যাম্পু বা সাবান ব্যবহার না করা।

৩। নদীতে অপরিস্কার বস্ত্রাদি না ধোওয়া।

৪। নদীতে গরু, মহিষ বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুকে স্নান না করানো বা তাদের জলে নামতে না দেওয়া।

৫। নদীতীরে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

৬। অসুস্থ মানুষের বস্ত্র নদীতে না ফেলে পুড়িয়ে ফেলা।

৭। বেওয়ারিস কুকুর, পাখি, বেড়াল বা অর্ধদগ্ধ মানুষের মৃতদেহ নদীর চরে বা নদীতে না ফেলা।

৮। কখনও ভুলবেন না যে গঙ্গানদী সমস্ত ভারতবাসী দ্বারা মাতৃবৎ পূজিতা।

২৫ এপ্রিলের ২০০৫, ৫ম পৃষ্ঠায় 'দি স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

গঙ্গা অববাহিকার ওপরে অবস্থিত ওজোন (Ozone) স্তরের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, গঙ্গার জল এবং বায়ু দূষণের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার প্রভাব ওজোনস্তরের ওপর পড়েছে এবং ফলে স্তরের ঘনত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। ডবসন ইউনিট (Dobson unit)-এর মাধ্যমে মেপে জানা গেছে গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত শহর, যেমন কানপুর, বারাণসী, পাটনা এবং কলকাতার ওজোন স্তরের হ্রাসের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ১২.৬, ১১.৩, ১৩.৫ এবং ১০.৮ ডবসন ইউনিট, যাদের প্রকৃত মাপ হওয়া উচিত ছিল যথাক্রমে ৩৭.৩, ৩২.৩, ৩৩.৮ এবং ৩২.৩ ডবসন ইউনিট (DU)।

অর্থাৎ টি, ও, সি (Total Ogone Column) পরিমাণ উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব গাঙ্গেয় অববাহিকায় অনেক হ্রাসের দিকে। ওজোনস্তরের হ্রাসের ফলে গঙ্গা অববাহিকায় বসবাসকারী ৪৪০ মিলিয়ন মানুষের স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আশার কথা এই, বর্তমান মোদী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারও গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

[***সৌজন্যে:*** *অপরাজিত, ২০০৪, বিশেষ গঙ্গা সংখ্যা*]

তারাপীঠের নদী দূষণের দায়িত্ব ধর্মীয় সংস্থাকেই নিতে হবে

মোহিত রায়

গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল (পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলার জন্য বিশেষ আদালত) পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু তীর্থস্থান তারাপীঠের ২৩৫টি হোটেলকে পরিবেশ দূষণের অপরাধে বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলায় বলা হয়েছে যে প্রায় ৪০০টি হোটেলের বর্জ্য জল কোনো শোধন ছাড়াই দ্বারকা নদীতে ফেলা হচ্ছে। তারাপীঠের মন্দিরের ফুল ও অন্যান্য পূজার বর্জ্যও নদীতে ফেলা হয়। এছাড়া নদীর পাড়ের যে শ্মশানটি আছে তার ধোঁয়া ও ছাইও দূষণ ছড়াচ্ছে। জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল এবিষয়ে জেলা শাসকের রিপোর্ট তলব করেছে। হঠাৎ এই আদেশের ফলে শত শত তীর্থযাত্রী খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন। এর প্রতিবাদে সেখানে ব্যবসায়ীরা একদিন বন্ধ পালন করেন।

তারাপীঠ গত দু'দশকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ২২৫ কিলোমিটার। বীরভূম জেলায় রামপুরহাট শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে গ্রামীণ এলাকায় সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধন কর্মের সঙ্গে এই স্থান জড়িত, এর সংলগ্ন শ্মশানটিও তান্ত্রিক সাধনার জন্য বিখ্যাত। আগে অসমের কামখ্যার যেমন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের জন্য নামডাক ছিল এখন তারাপীঠ অনেকটা সে স্থান নিয়েছে। বাংলা টেলিভিশনের জ্যোতিষ, বশীকরণ ইত্যাদির বিজ্ঞাপনকারী সাধুরা সবাই তারাপীঠে যজ্ঞক্রিয়ার কথা বলে থাকেন। এসবের জন্য তারাপীঠের প্রচার হয়েছে অনেক, তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে অনেকগুণ। গত দু'দশকে গ্রামীণ তারাপীঠ এখন ছোটখাট শহর যার মূল হচ্ছে ছোটবড় কয়েকশ' হোটেল।

হিন্দু ধর্মীয় স্থানগুলির পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খুব একটা সুনাম নেই। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দু'টি তীর্থস্থানের ব্যাপার দেখা যাক। মহাতীর্থ কালীঘাট বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ। এর কাছেই রয়েছে কেওড়াতলা মহাশ্মশান। এই তীর্থের সামনে দিয়ে বইছে আদি গঙ্গা। ভক্তরা পূজা দিয়ে এই আদিগঙ্গার জল মাথায় ছোঁয়ান। শ্মশানে দাহ শেষে এই জলে বিসর্জন দেন চিতাভস্ম, এই জলেই স্নান করেন কেউ কেউ। অথচ এই পবিত্র আদিগঙ্গা এখন নোংরা জলের ধারা, দুর্গন্ধে ভরা। সেখানে ভেসে চলে নানা বর্জ্য। অন্য কোনো ধর্মের মানুষ যদি এই তীর্থে আসেন তবে তিনি কী ধারণা নিয়ে যাবেন? এই ধর্মের প্রতি কি কোনো শ্রদ্ধা তার হবে?

আরেক পবিত্র তীর্থস্থান তারকেশ্বর। শিবের এই মন্দিরে পূজা দিতে যান হাজার হাজার ভক্ত, কাঁধে বাঁক নিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে যান হাজার হাজার পুণ্যার্থী। এই মন্দিরে রয়েছে পুণ্য জলাশয় দুধপুকুর। অত্যন্ত এই নোংরা পুকুরটিই ভক্তরা ভক্তিভরে ব্যবহার করতেন। শেষ পর্যন্ত এই পুকুরের সংস্কার কোনো ভক্ত বা মন্দির কর্তৃপক্ষ করলেন না, করলেন একজন পরিবেশকর্মী, আদালতের নির্দেশে। এসবে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়লে কি কোনো দোষ দেওয়া যাবে?

ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে তারাপীঠে। তারাপীঠের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দ্বারকা নদী। ঝাড়খণ্ড থেকে নেমে আসা এই নদী বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে মধ্য বাংলা দিয়ে মেশে ভাগীরথী নদীতে। রাঢ় বাংলার এই নদীগুলিতে জল সবসময় বেশি থাকে না। ফলে এই নদীগুলির ব্যবহার ঠিকমতো না হলে তা দ্রুত দূষিত হতে পারে। একই ভাবে

নানারকম বর্জ্যে পরিপূর্ণ দ্বারকা নদী।

দূষিত হয়েছে অজয় নদ। গত দেড় দশকে তারাপীঠের খ্যাতি বাড়লে ছোট গ্রামীণ অঞ্চলে আসতে থাকেন অনেক অনেক পুণ্যার্থী। এঁদের পরিষেবা দিতে গড়ে উঠেছে অনেক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বাজার, বাসস্ট্যান্ড। এঁদের কারোরই পরিবেশ দূষণ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। এছাড়া আমাদের দেশে এরকমভাবে চোখের ওপর কোনো জনপদ দ্রুত বেড়ে গেলে তাকে পরিকল্পনা করে নিয়ন্ত্রণ করা— এসবের কোনো বালাই নেই। উন্নয়ন চলে কোনো নিয়মকানুন ছাড়াই। ফলে দেখা গেল হোটেলগুলির বর্জ্য অপসারণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। জায়গাটি এখনও পঞ্চায়েতের অধীন, এর পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক ক্ষমতা সবই সীমিত। ফলে সমস্ত বর্জ্য ফেলা হতে থাকল নদীর পাড়ে। তারাপীঠে দ্বারকা নদীর পাড়ে গহন জঙ্গলের মধ্যে মহাশ্মশানে সাধনা করতেন তান্ত্রিকরা। সেই জঙ্গল দিনে দিনে হারিয়ে গেছে। এমনকী স্যাটেলাইট চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০০১ সালে এই বন যতটা ঘন ছিল, ২০১৪ সালে তা অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেছে।

এসময় সরকার কী করছিল? না, সরকার তার দায়িত্ব পালন করেনি। বিশেষত দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মজার কথা, আদালত হোটেল মালিকদের শাস্তি দিয়েছে কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাউকে শাস্তি দিল না। মনে রাখতে হবে যে এটা একটা দুটো হোটেলের দূষণের ব্যাপার নয় যা চোখ এড়িয়ে যেতেই পারে। এখানে একটা ছোট জায়গায় ৪০০ হোটেল দূষণ ছড়াচ্ছে অথচ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকেরা কেউ তা দেখলেন না। আমাদের আদালত সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারে বড়ই দয়ালু!

কিন্তু আসল দায়িত্ব তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের। এই মন্দিরকে ঘিরেই তারাপীঠের এই সম্প্রসারণ। এই হোটেলগুলিতে থাকতে আসেন মন্দিরের ভক্তরাই, এই স্থানের ব্যবহারকারীরা সবাই এই মন্দিরের জন্যই এখানে এসেছেন। ফলে মন্দির কর্তৃপক্ষ সেই দায়িত্ব এড়াবেন কীভাবে? যে দ্বারকা নদীর পাড়ে মহাশ্মশান, যে নদীতে ভক্তরা স্নান করে পূজা দিতে আসেন— সে নদী রক্ষার প্রধান দায়িত্ব মন্দির কর্তৃপক্ষের। এই কথাটি আজ হিন্দু মন্দির ও ধর্মস্থানের কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবেই।

আসলে দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুধর্মের অভিভাবকেরা সমাজের প্রয়োজনীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা শুধু শুষ্ক ধর্মচর্চা করে যাচ্ছেন, হিন্দু সমাজের রোজকার জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকেও তাঁরা দেখেন না। ফলে আজ যখন জেহাদি বোমা ফাটছে, সরকার জেহাদিদের তোয়াজ করছে, ধর্মীয় জনসংখ্যার বিরাট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে— তখনো হিন্দুধর্মীয় সংগঠনগুলি কেবল পুজোআচ্চাতেই ব্যস্ত। পরিবেশ দূষণের মতো একটি আধুনিক ও জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে তারা অজ্ঞ থাকতেই চেয়েছেন। ফলে আদিগঙ্গা, দুধপুকুর বা দ্বারকার জল দূষিত হয়ে সাধারণ মানুষের ও হিন্দুধর্মের— সবারই ক্ষতিসাধন করছে। ■

গঙ্গাদূষণ রোধে : কিছু তথ্য

(১) সেন্ট্রাল পলিউশান কন্ট্রোল বোর্ড (সি পি সি বি) তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলেছে, গঙ্গায় শিল্প-কারখানার বর্জ্য জল জমা হওয়ার আগে মাত্র ৪৯ শতাংশ পরিশোধিত হয়।

(২) এদের তথ্য বলছে, সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এস টি পি)-এর অভাব। বর্তমানে এ রাজ্যে প্রতিদিন ১৩১১ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয়। যার মধ্যে ৪৭ শতাংশই কলকাতার। ৩৪ প্রকারের এস টি পি 'ইনস্টলেশন ক্যাপাসিটি' দৈনিক ৪৫৭ মিলিয়ন লিটার। যা প্রকৃত ব্যবহার্য মাত্র দৈনিক ২১৪ মিলিয়ন লিটার। যা চাহিদার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। মাত্র ৪৯ শতাংশ।

(৩) উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা-উপত্যকায় ৫১টি এস টি পি-র সর্বমোট 'ইনস্টলেশন ক্যাপাসিটি' ১০০৯ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। যদিও এর মধ্যে প্রকৃত ব্যবহার্য প্রায় ৬০২ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। যা চাহিদার ৫৯ শতাংশ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চিঠিপত্র

হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি

সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে যেভাবে ইসলামি মৌলবাদের দৌরাত্ম্য গ্রাস করছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিশ্বের শান্তিকামী প্রায় সকলদেশই আজ এই আতঙ্কে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে, যেখানেই এই মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ছে, সেখানেই এই মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। আর শুধু বৃদ্ধি পাওয়াই নয়, তাদের মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী বীভৎস রূপও প্রায় সকল দেশকেই চিন্তান্বিত করে তুলেছে। এদের ইতিহাসে সৃষ্টির কোনও স্থান নেই। যারা তাদের ভিন্ন মত পোষণ করবে তারাই কাফের। সুতরাং তাদের মতে কাফেরদের একমাত্র শাস্তি কোতল না হয় ধ্বংস। এই ইসলামি মৌলবাদ আজ সারা বিশ্বের মহাআতঙ্ক। তাই তো দেখা যাচ্ছে, প্রায় সকল দেশই আজ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছে। সম্প্রতি যে সমস্ত দেশ এই মৌলবাদের জন্মদাতা যেমন— পাকিস্তান, সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তান, তারাও যে খুব একটা সুখে আছে তা নয়। পাকিস্তানের বুকে উপর্যুপরি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ও জঙ্গি আক্রমণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যা বিন্যাসের যে চিত্র বর্তমানে আমাদের চোখে পড়ে তাতে দেখা যাচ্ছে মুসলমান জনসংখ্যা একদিকে যেমন দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অপরদিকে হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে কমছে। যা খুবই উদ্বেগের বিষয়।

শুধু তাই নয়, মুসলমান সংখ্যাধিক্য উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলায় তাদের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তখনই প্রশ্ন উঠবে পশ্চিমবঙ্গ ভাগের। যার পূর্বাভাস শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনেক আগেই দিয়েছেন।

অতএব হিন্দু ভায়েদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন,---প্রত্যেক পরিবারের অন্তত চারটি সন্তানের জন্ম দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই যুক্তি অনেক আধুনিক পশ্চিমি ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দুরা শুধু অবাস্তব বলবেন না, পাগলামি বলে গালি দিবেন। অন্তত সেকুলারবাদী সাম্প্রদায়িকতার ভেকধারীরা।

হিন্দুরা এখন থেকেই সতর্ক হোন এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,** মুন্সীরহাট, হাওড়া

হিন্দুত্ব

হিন্দুত্ব নিয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, 'হিন্দুত্ব' এক জীবন ধারা (way of life)। হিন্দুত্বের ভিত্তি স্বরূপ তিনটি মূল মহামন্ত্র—(১) 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'—অর্থাৎ সবাই সুখে থাকুক, সবাই নীরোগ থাকুক। (২) 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—অর্থাৎ পৃথিবীর সবাই আত্মীয়। (৩) 'সর্বং খল্বিদ ব্রহ্ম' —অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করে। হিন্দুদের জীবন-যাপনের মধ্যে সবাইকে আত্মীয় করে নেওয়ার সহজাত প্রবণতা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। কারও প্রতি হিংসা দ্বেষ পোষণ করা হিন্দুদের স্বভাব বিরুদ্ধ। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মন্ত্রের প্রভাবে হিন্দুরা নদী, পাথর, গাছ, বিষাক্ত গ্যাস, বন্য জন্তু, বিভিন্ন প্রাণী অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান ও প্রাণীকে পুজোর মাধ্যমে রক্ষা করে থাকে। এই সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান ও প্রাণীকে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তাই হিন্দুত্বের মূল ভাবনা। কে না জানে আজ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমালয় ও অন্যান্য পাহাড় পর্বতের বরফ গলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প বৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খরা, পানীয় জলের অভাব, ফসল না হওয়া এখন সমস্যা রূপে দাঁড়িয়েছে। ভোগবাদী মানসিকতা পূরণ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর অরণ্য আজ ফাঁকা স্থানে পরিণত। গাছের অভাব আজ বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। মনুষ্যজাতি বাঁচবে কি করে? বিভিন্ন কারখানার বর্জ্য পদার্থে নদী-নালা, সমুদ্রের জল দূষিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবী ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিত্রাণের উপায় একমাত্র 'হিন্দুত্ব'। একারণে পরিবেশ দূষণ রোধে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে আয়োজিত সম্মেলনের 'থিম' ছিল--- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্।' আধুনিক বিশ্ব যত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা ভারতবর্ষের এই জীবনধারা মেনে নেবে তত তাড়াতাড়ি বিশ্বের মঙ্গল।

— **প্রদীপ সাহা,** হরিণঘাটা, নদীয়া

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

একটু ভাবুন

সঞ্জীব বাগচী

গত লোকসভা ভোটের পর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে বাড়বাড়ন্ত বিশেষ করে মানুষ যেভাবে ভরসা করছেন সকলেই চান ২০১৬-তে বিজেপি যেন রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। সে সাধারণ মানুষ থেকে উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত। সেই পরিস্থিতিতেই মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগে উঠছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যের শাসনভার নেওয়ার জন্য তৈরি তো? কেন প্রশ্নটা উঠল বলি। একটি নগরের বাসিন্দা হিসেবে আমার বহু লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি বিভিন্ন মানুষ বিজেপি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। পার্টির ইতিহাস অথবা পার্টির মূলনীতি বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা অবহিত নন। এমনকী এই ব্যাপারটি আমাদের বহু পদাধিকারীর মধ্যেও আমি লক্ষ্য করেছি। ফলে বহু জায়গায়ই দলটি ঠিক দক্ষিণপন্থীদের মতোই চালাচ্ছেন তাঁরা। শুধু ক্ষমতা দখলটাই বর্তমানে তাঁদের কাছে উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভারতীয় জনতা পার্টির মূল উদ্দেশ্য তা তো বলে না। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রণীত বিজেপির মূলনীতি একাত্ম মানবদর্শন কিংবা পঞ্চশীল সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। উদ্দেশ্য তো এটাই, উপযুক্ত মানুষ তৈরি করে ক্ষমতায় এসে সুষ্ঠুভাবে দেশ গঠন করে ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা জানি মোদীজী তা করবেন। তিনি যে স্বচ্ছ ভারতবর্ষের আহ্বান জানিয়েছেন তাতো শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা নয়, আন্তরিক পরিচ্ছন্নতাও বটে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কি সেই পথে হাঁটছে। বিশেষত লোকসভা ভোটের পর যেভাবে বাছবিচারহীন ভাবে মানুষকে ঢোকানো হচ্ছে তাতে জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে—সেই বর্তমান শাসকদলের প্রতিরূপই ফুটে উঠবে নাতো? কারণ তাঁরা দেখছেন যে মানুষটা দুদিন আগে সিপিএমে ছিল, তারপর তৃণমূলে এল, এখন আসছে বিজেপিতে শুধু নিজেদের সুবিধা ভোগ করতে। তাতে তাঁরা স্বভাবতই আশঙ্কিত হচ্ছেন। কারণ, মানুষ প্রচুর ভরসা নিয়ে বিজেপিকে চাইছে। তাঁরা বলছে, কোনো সুবিধাবাদী যেন এখানে সুযোগ না নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিজেপি কি এরাজ্যে সাংগঠনিকভাবে তৈরি? শুধু ক্ষমতা পেলেই হয় না, তা ধরে রাখতে পারাটা আরও কঠিন কাজ। অতি নির্মমভাবে বলতে হয়, বড় বড় শহরগুলি ছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টি এখন উপযুক্ত শিক্ষিত মানুষকে বের করে আনতে পারেনি। এমন কর্মীও আমরা দেখছি যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করছেন, তাঁরা সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা এটুকুও বোধ করেন না, সঙ্ঘ হল জননী ভারতীয় জনতা পার্টির। এই অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা বিজেপিকে তৃণমূলের মতোই মনে করে। একটি কথা অস্বীকার করার তো নেই, গত লোকসভা ভোটের রেজাল্টের কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই নরেন্দ্র মোদীর। তার প্রভাবেই পশ্চিমবঙ্গে এই ফল। এখন এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য রাজ্যের কোনে কোনে বিজেপির মূলনীতিকে পৌঁছে না দিলে, সংগঠনকে দৃঢ় করলে এই সাফল্যের ফানুস যেমন ফুলেছিল তেমনি কমে যাবে। এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। যা আজকে তৃণমূলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ব্যক্তিগতভাবে বলি, সমস্ত দলের পতনের মূল এই বেনোজল। একে না আটকালে কিন্তু সাফল্যের স্বাদ কিন্তু অল্পদিনের হবে। এখন থেকেই বাছাই হওয়া দরকার যেসব কর্মী এমনকী নেতারাও তৃণমূলের সঙ্গে টাইআপ করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছেন তাঁদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। নচেৎ ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। দলের প্রকৃত কর্মী নির্বাচন করে দলের রাশ শক্ত হাতে ধরে দলকে সুগঠিত করে কর্মদক্ষতা অর্জন করে ক্ষমতায় যাওয়াটা ভালো হবে, না কি অযোগ্য লোক নিয়ে ক্ষমতায় যাবেন—বিজেপির উচ্চনেতৃত্বরা একটু ভাবুন। ■

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

পরম্পরা

বিলুপ্ত বিদ্যা : শবসাধনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

তন্ত্রসাধনার মধ্যে একটি প্রখ্যাত সাধনা শবসাধনা। শবসাধনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সম্যক কোনো ধারণা না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ প্রমুখ সাহিত্যিকের কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালি মহলে একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে।

শব কি? প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে দেহ নির্মিত। যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয় তখনই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মারা যায়। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহকেই শব বলে। এখন শবসাধনার অধিকারী ব্যক্তি কারা? শবসাধনা সবাই করতে পারে না। ভূতডামর তন্ত্রের বচনে বলা হয়েছে, 'পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ। পুত্রদারাধনস্নেহ লোভমোহবিবর্জিত।' অর্থাৎ পুরশ্চরণসম্পন্ন যে বীরসাধক স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহে আসক্ত নন এবং ধনলোভ ও মোহ যাঁর নেই তিনি এই সাধনার অধিকারী।

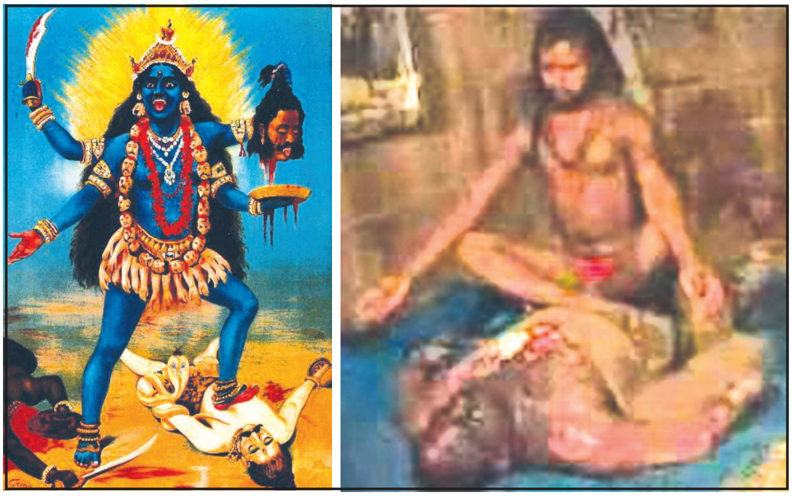

পুরশ্চরণ কি? মহানীলতন্ত্রের ২৬ পটলে পুরশ্চরণ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'পূর্যতে চরণং তস্য জপ, হোমাদিতর্পণৈঃ' অর্থাৎ এই নামের তাৎপর্য এই যে এতে জপ হোম ও তর্পণের দ্বারা ইষ্টদেবতার চরণ পূর্ণ করা হয়। যামলাদি তন্ত্রমতে নামটির তাৎপর্য— মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ সর্বপ্রথমে সম্পন্ন হয়। পুরশ্চরণের পাঁচটি অঙ্গ— জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন। বীরপুরশ্চরণে সাতটি অঙ্গ। ষষ্ঠটি শক্তিপুজো এবং সপ্তমটি কুমারীপুজো। পুরশ্চরণ ব্যতিরেকে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। তান্ত্রিকসাধনার ক্ষেত্রে 'বীর' শব্দটি পরিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক। কৌলমার্গরহস্য গ্রন্থে বলা হয়েছে— যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পেয়ে, বীরের মতো অবিদ্যারজ্জুছেদনে কৃত প্রযত্ন হয়ে অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হতে চায় তার নাম বীর। তাছাড়া বীরভাবের সাধনার মধ্যে ভৈরবীসাধনা, চিতাসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে সমস্ত সাধনা রয়েছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে সকল সাধনা সহজপর নয়। এজন্য এই সমস্ত সাধনায় প্রবৃত্ত সাধককে বীর বলা হয়। রুদ্রযামল তন্ত্রের বচনে বলা হয়েছে— 'বীরভাবে মন্ত্র সিদ্ধিঃ দ্বৈতাচারলক্ষ্মণম্' অর্থাৎ বীরসাধক অদ্বৈতভাবের সাধক। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে একটি তন্ত্রবচন উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে— 'যিনি প্রতিযোগী। ইদং' পদার্থকে অহং' পদার্থে বিলীন করতে পেরেছেন, যাঁর চিত্ত সদা আনন্দে নিমগ্ন তাঁর নাম বীর। এই সূত্র এবং বৃত্তির তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে কৌলমার্গরহস্য গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'অহং' শব্দের অর্থ আত্মা বা আমি আর 'ইদং' শব্দের অর্থ অহং পদার্থের প্রতিযোগী অর্থাৎ আমি পদার্থ ব্যতিরিক্ত সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ। যে সাধক সাধনার দ্বারা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থকে অহং অর্থাৎ আমি বলে মনে করতে পারেন, তাঁর নিকট অহং হতে ভিন্ন আর কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই ইদং বা জগৎ অহং পদার্থে বিলীন হয়ে যায়। এই প্রকার বীর সাধক অহং পদার্থকে কেবল নিজের দেহমধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ না রেখে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।

নির্বাণতন্ত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, বীরসাধকের মূর্তি সর্বদা তপঃপরায়ণ। তাঁর আলম্বিত কেশজাল অসংস্কৃত। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষমালা এবং তিনি কৌপীনধারী হবেন। সে অঙ্গে ভস্ম ও রক্তচন্দন মাখবে। সর্বদা ক্ষমাশীল হবে। দান ধ্যান তপস্যা করবে। সর্বত্র তার সমভাব থাকবে। যে নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ, নানা কর্মে বিশারদ, স্ত্রীজাতি যে সর্বদা ইষ্টদেবীর মতো মনে করে, সেই জিতেন্দ্রিয় মহাজ্ঞানী সাধকই ভারতবর্ষে বীরসাধক বলে খ্যাত। শব সাধনায় সাধককে অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে এই সাধনায় ব্রতী হতে হয়। তাই বীরসাধক ছাড়া এ সাধনা সম্ভব নয়। কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে— বীরসাধক নির্ভয়, অভয়দানকারী, গুরুভক্তিপরায়ণ, বলবান্, যোদ্ধা, মহাযোগী, মহোৎসাহী, মহাবুদ্ধি ও মহাসাহসী হবে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, বীরের সাধনমাত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ।

যোগিনীহৃদয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, বীরসাধনা ছাড়া শীঘ্র সিদ্ধিকর আর কিছুই নাই। এ ধরনের তন্ত্রবাক্য বহু রয়েছে। ‘কৌলাবলী নির্ণয়’ গ্রন্থে বলা হয়েছে— বীরসাধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র সিদ্ধিদায়ক আর কিছু হতে পারে না। তবে তন্ত্রশাস্ত্রমতে বীরের সাধনা গুহ্যসাধনা। এই সাধনায় পুজো, মন্ত্রযন্ত্র সব ব্যাপারেই গূঢ় সঙ্কেত রয়েছে। একমাত্র সদ্‌গুরু মুখেই এসব সঙ্কেতের অর্থ অবগত হওয়া যায়। সেজন্য ‘নিরুত্তরতন্ত্র’ গ্রন্থে বলা হয়েছে— ক্রমসঙ্কেত, পুজোসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত ও যন্ত্রের লিখন সঙ্কেত গুরুপরম্পরায় জানতে হবে। যে বীর সঙ্কেতজ্ঞ নয় তার পুজো নিস্ফল তো হবেই, বরং পদে পদে তার বিপদ ঘটবে। সেজন্য এইসব সাধকের পালনীয় নানা বিধিনিষেধ তন্ত্রে নির্দিষ্ট রয়েছে।

শবসাধনার স্থান ও কাল প্রসঙ্গে শবসাধনার প্রারম্ভেই সাধনার স্থান ও কাল নির্বাচন করা আবশ্যক বলে বলা হয়েছে। ‘ভাবচূড়ামণি’ গ্রন্থে বিধান দেওয়া হয়েছে— শূন্যাগারে, নির্জন নদীতীরে, পর্বতে, বিল্বমূলে অথবা শ্মশানে শবসাধনা করতে হবে। কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী যদি মঙ্গলবারে পড়ে তাহলে সেই মঙ্গলবার রাত্রিতে শবসাধনা করলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়। ‘শ্যামারহস্য’ গ্রন্থে ওই একই কথা বলা হয়েছে, তবে মহাশ্মশানে শবসাধনা প্রশস্ত বলে বলা হয়েছে। কিন্তু কৌলাবলীনির্ণয় গ্রন্থে শ্মশানকেই শবসাধনার শ্রেষ্ঠস্থান বলা হয়েছে। কারণ শ্মশানে কালী বিরাজিতা এবং শিবাবলি দেওয়ার উপযুক্ত স্থান। তন্ত্রসারে বলা হয়েছে, গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যে কালী সর্বদা শ্মশানে বাস করেন তিনি শ্মশানকালী। এই দেবীর আরাধনা শ্মশানেই করতে হয়, আর কুলচূড়ামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে— সাধক সন্ধ্যাকালে শ্মশানে গিয়ে ‘কালী কালী’ এই বলে ডেকে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করলে শিবারূপি উমা পরিবারগণের সঙ্গে পশুরূপধারণ করে সেখানে আসেন এবং তা ভোজন করেন। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রের ১/১৬/২১ মন্ত্রে রয়েছে, শিবাকে অর্থাৎ শৃগালিকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র পড়ে তার পুজো করার বিধান। এই শিবাপুজোই তন্ত্রশাস্ত্রে শিবারূপ কল্পনার এবং বিবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়ার শিবাবলি দেবার বিধানের মূল।

শবসাধনার শব কেমন হবে? শবসাধনায় কতকগুলি শব যেমন শাস্ত্র মতে প্রশস্ত, তেমনি কতকগুলি শব নিষিদ্ধ। পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থে বলা হয়েছে, লাঠির আঘাতে, শূলবিদ্ধ, খড়্গাঘাতে, জলমগ্ন হয়ে, রজ্জুবদ্ধ হয়ে, সর্পদংশনে এবং সম্মুখসমরে মৃত শব প্রশস্ত। কিন্তু স্বেচ্ছামৃত, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক, দ্বিজ, অন্নাভাবে মৃত, কুষ্ঠরোগে মৃত, দু’বছর বয়সের মৃত শিশু, সাতরাতের আগে মৃত এই আট প্রকারের শব বর্জন করতে বলা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যদিও উপযুক্ত শবের অভাবে কুশ বা যবতণ্ডুলাদি দ্বারা নির্মিত শব ব্যবহৃত হতে পারে বলেছেন।

শব-সাধনায় বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে এসব দ্রব্যের তালিকা দেওয়া রয়েছে। তন্ত্রে এইসব দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কৌলাবলী নির্ণয় গ্রন্থ অনুসারে শবসাধনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো— মৎস্য, মাংসযুক্ত অন্ন, গুড়, ছাগ, পিষ্টক, পায়সান্ন, সুরা, মাষকলাই মিশ্রিত অন্ন, তিল, কুশ, শ্বেতসরিষা, দীপ, ধূপ, এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, খয়ের, আদা, তাম্বুল, পট্টসূত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, প্রাদেশ প্রমাণ যজ্ঞকাষ্ঠ, পঞ্চগব্য এবং স্বকল্পোক্ত পুজোর দ্রব্য। এখানে একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন, শবসাধনেচ্ছু সাধককে ভোজন করে তবেই সাধনার স্থানে যেতে হবে। সাধনস্থানে উপস্থিত হবার পর সাধককে তন্ত্রসম্মত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়। যেমন— যাগভূমি প্রোক্ষণ, গুরু গণেশ বটুক, যোগিনী, মাতৃকা প্রভৃতির পুজো, সাধন স্থানে উপস্থিত দেবতা রাক্ষস, পিশাচ, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব ইত্যাদির উদ্দেশে যথাবিধি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, শ্মশানাধিপতি ভৈরব, কালভৈরব এবং মহাকালের কাছে বলিদান, অঘোরমন্ত্র বা সুদর্শন মন্ত্রে রক্ষাবিধান ও জয়দুর্গামন্ত্র উচ্চারণ করে দশদিকে শ্বেতসরিষা বিকিরণের পর সাধনা শুরু করতে হবে।

সাধক শবকে যথাশাস্ত্র সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে ধূপ এবং অগুরুচন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলিপ্ত করবেন। মুখে এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর খদির এবং তাম্বুল দিয়ে শবকে অধোমুখ করতে হয়, তারপর তার পিঠে চন্দন মাখিয়ে দিতে হবে। সাধক শবের বাহুমূল থেকে কটি পর্যন্ত চতুরস্র ভাবনা করবেন তার মধ্যে চতুর্দ্দার অষ্টদল পদ্ম ভাবনা করে তার উপর কম্বলাবৃত মৃগচর্ম স্থাপন করতে হয়। এবার দ্বাদশ আঙুল মাপের যজ্ঞকাষ্ঠ চারিদিকে স্থাপন করে সমস্ত লোকপাল শবাধিস্থান দেবতা, চতুঃষষ্ঠি যোগিনী ও ডাকিনীদের সামিষবলি প্রদান করতে হয়। এবার সাধক শবকে স্পর্শ করে প্রণাম করবেন যে মন্ত্রে— হে বীর পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর। আনন্দ ভৈরবাকার দেবী পর্যঙ্ক সংস্থিতঃ। বীর অহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে।’ শব স্পর্শের পূর্বে সাধক ‘ওঁ ফট্’ এই মন্ত্রে শব প্রোক্ষণ করবেন এবং ‘ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ’ এই বীজমন্ত্র পড়ে শবের উপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবেন। এবার সাধক যথাশাস্ত্র আসনের পুজো করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অশ্বারোহণ ক্রমে শবের উপরে উপবেশন করবেন এবং নিজের পায়ের তলায় কুশ স্থাপন করবেন। সাধক শবের ঝুঁটিতে পিঠ পূজাদি করে ষোড়শোপচারে দেবীর পুজো করবেন। তখন শব আর সাধারণ শব নয়। তার মধ্যে দেবতার আবেশ হয়েছে। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে— ‘ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যয়নং চরেৎ।’ উল্লেখ্য শব পঞ্চভৌতিক সত্তার শুদ্ধরূপ। যে নিষ্পাপ বাসনা কামনাহীন। এজন্যই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যাকে শবদেহে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। শবদেহকে আশ্রয় করে নির্গুণা সগুণা হন। দেবী ভাগবতে নির্গুণা শক্তিকে সংসার বিরাগী সাধকদের পূজ্যা বলা হয়েছে। নির্গুণা জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী।

এরপর সাধক শবমুখে কারণবারি

প্রদান করে উঠে দাঁড়াবেন এবং শবের সম্মুখে সিদ্ধিলাভের জন্য যে প্রার্থনা জানাবেন বীরতন্ত্র বচনে তা বলা হয়েছে— ‘বশমে ভবদেবেশ সমামুকং পদং ততঃ। সিদ্ধিংদেহি মহাভাগ ভূতাশ্রয়পাদমবঃ।’ অর্থাৎ হে দেবেশ অমুক ব্যক্তি আমি আমার বশ হও। সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল হে মহাভাগ, আমায় সিদ্ধি দাও। তারপর সাধক মূলমন্ত্র পড়ে পট্টসূত্র দিয়ে শবের পা দু’খানি খুব শক্ত করে বাঁধবেন এবং একটি মন্ত্র পড়ে শবের পায়ের তলায় ত্রিকোণচক্র আঁকবেন। কৌলাবলী নির্ণয় গ্রন্থে এই মন্ত্রটি বলা হয়েছে— ‘ওঁ ভীম ভীরু ভয়াভাব ভবলোচন ভাবুক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।’ এরপর সাধক পুনরায় শবের উপর আসন গ্রহণ করবেন। সাধক স্থিরচিত্ত হয়ে দেবীর ধ্যান করে মৌন ভাবে যথাবিধি জপ করবেন। সিদ্ধিলাভ সহজ ব্যাপার নয় তাই এসময় সাধককে নানা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। যথাবিধি জপাদি সমাপ্ত করে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়েছে জেনে সাধক শবের ঝুঁটি এবং পায়ের বাঁধন খুলে দেবেন। পায়ের তলায় আঁকা চক্র মুছে ফেলবেন। পুজোদ্রব্য জলে এবং শবকে গর্তে বা জলে বিসর্জন দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন। পরের দিন নিত্যকর্ম সমাধা করে সাধক পঞ্চগব্য পান করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। কৌলাবলী নির্ণয় গ্রন্থে বলা হয়েছে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট বিধানে সাধনা করলে সাধক নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করবেন। তবে শাস্ত্রে সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির অকল্যাণের জন্য শবসাধনা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সমাজের কল্যাণের জন্য তা করা যাবে।

এখন প্রশ্ন, শবসাধনা কীভাবে সম্ভব? আদিম মানুষেরা মনে করত মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা থাকে। মৃতের আত্মার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মানই মানুষের ধর্মের মূল। সাধক তার তপঃশক্তির প্রভাবে এই আত্মাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অথর্ববেদে এই শক্তিকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম (১/১০/৩-৪)। এটি তপঃশক্তি। ব্রহ্মবিদ্যা বলে ঋষিরা মুমূর্ষুকে আরোগ্য করতে পারতেন। এমনকী মৃতকে জীবনদান করতে পারতেন। আর জীবমুক্তির জন্য প্রয়োজন দেহের। রসেশ্বর দর্শনে মুক্তির জন্য স্থির দেহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। স্থির দেহ না হলে দেহের স্ফূরণই হয় না। আর শিবের কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভরশীল তখন শিব মুক্তি দিতে পারেন না। মুক্তি দেন শক্তি। তাই শবসাধনায় শক্তির উপাসনা হয়। যদিও গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে— যিনি শক্তি তিনিই শিব। এঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। শবসাধনার ক্ষেত্রে চরম কথাটি বলা হয়েছে বামকেশ্বর তন্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যায়— বস্তুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত মর্মার্থ রয়েছে। এই সামর্থ্যই শক্তি। এই শক্তিই আদ্যাশক্তির বিভূতি। শক্তির আধার শিব প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশরূপে অবস্থান করছেন। বস্তুত প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম বা গুণ বিমর্ষ-শক্তির এবং বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ শিবের বিভূতি। শিবপ্রকাশ শক্তি বিমর্ষ। বিমর্ষ প্রকাশেরই ধর্ম। শিবশক্তি স্বরূপত অভিন্ন। প্রকাশ ও বিমর্ষকে যেখানে পৃথক ভাবা হয় সেখানেও উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। লক্ষ্য করা গেছে বিমর্ষ শক্তিই চিৎশক্তি বা পরাশক্তি। এই চিৎশক্তিকে জাগানোই শবসাধনা। ■

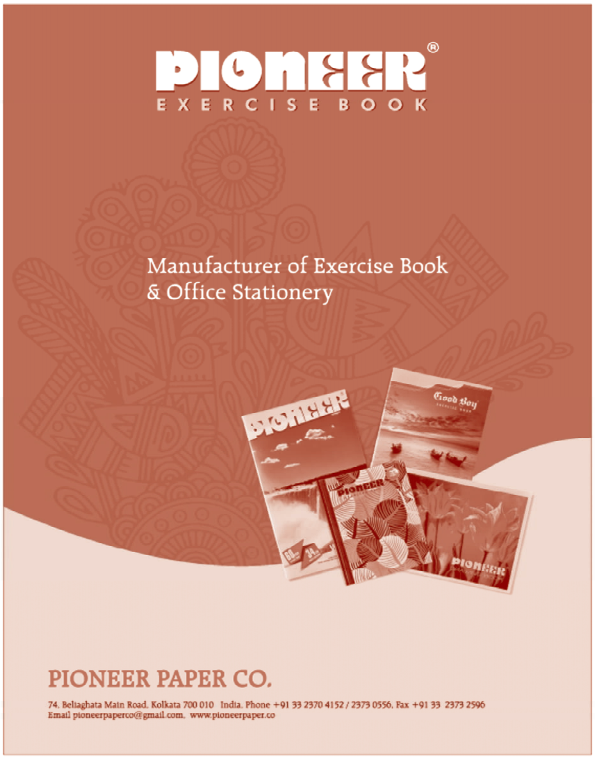

নেত্রদান মহাদান

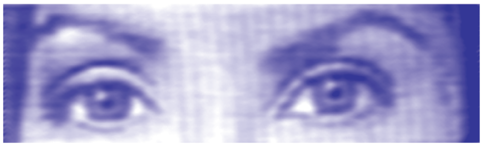

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

শেখার তাগিদ

ছোটোরা নানারকম প্রশ্ন করুক ঠিকমতো শেখার জন্য

কৌশিক গুহ

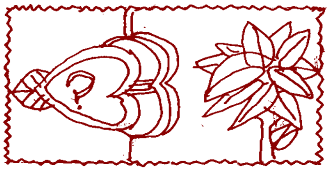

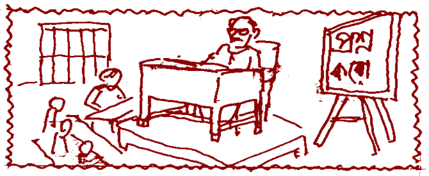

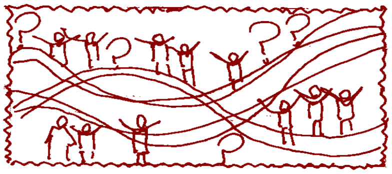

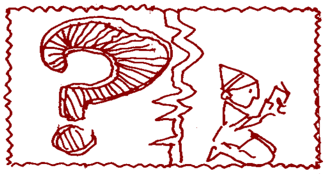

শেখা, জানা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অভ্যাস— এসব জড়িয়ে থাকে শিক্ষার সঙ্গে। ধাপে ধাপে এগোতে হয়। চটজলদি ওসব রপ্ত হতে পারে না। সময় লাগে। কতরকমভাবে শিখতে হয় আমাদের। খুব ছোটবেলায় গল্প শুনি। তারপর নানা বিষয়ে প্রশ্ন করি। জানতে চাই। একটু একটু করে শেখা শুরু। এগোবার পর আলোচনা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা। শেখার ক্ষেত্রে কখনও পূর্ণচ্ছেদ টানা যায় না। তা চলতে থাকে। ওটা না থাকলে সব বিদ্যা ভোঁতা হয়ে যায়। অনবরত চর্চা চালিয়ে যাওয়া দরকার। স্কুলে আমরা একসঙ্গে অনেকে শিখি সুন্দর পরিবেশে আনন্দ করে। একা একা বাড়িতে বসে সেটা হয় না। শেখাবার দায়িত্ব যাঁর তিনি অবশ্যই সুযোগ্য হবেন। ছেলেমেয়েদের মন বুঝতে চাইবেন। যত্ন করে শেখাবেন। তাদের ভালোবাসবেন। প্রতিটি ছেলেমেয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। মনে রাখা দরকার, শিক্ষা অনুশীলনেরই এক রীতি। সুশিক্ষা দেন কারা? সুশিক্ষকরা। তাঁরা গড়ে দেন ছেলেমেয়েদের। যে কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য চাই। যে শিখবে তার আর যিনি শেখাবেন তাঁরও। 'ভালো করে লেখাপড়া করলে ভালো চাকরি পাওয়া যেতে পারে।'— একথা বাড়িতে এবং বাইরে ছোটোদের বোঝানো হয়। কখনও বলা হয় না, 'সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য পড়াশোনা দরকার।'

শেখার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। ঘরে সবক'টা জানালা খোলা রাখলে চারদিক থেকে বাতাস আসবে। শেখার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে, কিছু পদ্ধতি রয়েছে। বোঝা দরকার। মুখস্থ করলে সব হবে না। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে। উত্তর খুঁজতে হবে সেসবের। বিদ্যা মানে শুধু ডিগ্রি অর্জন আর তার জন্যে গর্ব অনুভব করা নয়। যিনি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তাঁকে থেমে থাকলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। নিজেকে আপ-টু-ডেট রাখা সবসময় দরকার। যারা শিখবে আর যাঁরা শেখাবেন তাঁদের এটা মনে রাখা চাই। আজকের ইলেকট্রনিক্স যুগে নতুন মাস্টারমশাইদের অনবরত চর্চায় তৈরি থাকতে হয়। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়— সব জায়গাতেই ছাত্র আর শিক্ষককে তৈরি থাকতে হবে ঠিকভাবে শেখা ও শেখানোর জন্যে।

যারা শিখতে আসে তাদের বোধ বিবেচনা কম থাকে। যত্ন করে এগিয়ে দিতে হয় অভিভাবকদের। সমর্থন, উৎসাহ, সহযোগিতা, পরামর্শ সবসময় চাই। শিক্ষক সব ছেলেমেয়েকে একরকমভাবে দেখেন। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অনেক সময়েই ভেবে উঠতে পারে না কোনদিকে এগোবে, কীভাবে এগোবে। ছাঁচে ঢালা পদ্ধতিতে সব ছেলেমেয়েকে শেখানো যায় না। আগামীদিনে যারা দায়িত্ব নেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ঠিকভাবে তৈরি করা দরকার।

শেখা চলবে ধারাবাহিকভাবে। শৃঙ্খলায় গড়ে ওঠে ভালো বোঝাপড়া। পড়ালেখাও তার মধ্যে পড়ে। প্রকৃত শিক্ষকরা প্রশ্নহীন ছাত্র চান না। তাঁরা চান ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করুক। নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার মধ্যে শেখাটা হয়ে যাবে। সব ধরনের প্রশ্ন ছোটোদের মনে জাগবে। শিক্ষক ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দেবেন। উত্তর জানা না থাকলে একদিন পরে তিনি উত্তর দেবেন।

বিজ্ঞানী সি ভি রমন একটি সরল প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন, 'কেন আকাশ নীল?' প্রশ্নটি যথাযথ হওয়া দরকার। উত্তর দেওয়ার জন্যেও চাই দক্ষতা এবং প্রতিভা। প্রশ্ন চলতে থাকবে। শেখার পদ্ধতি, ভাবনা, রীতি বদলে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এখন প্রশ্ন করতে ভুলে যাচ্ছে। কিংবা তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না। আজ ছোটোদের বলতে হবে, প্রশ্ন করা থামাবে না। জানতে চাও আরও? তবে প্রশ্ন করো। জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের জননী। স্কুল যাওয়ার বয়েস হয়নি এমন ছেলেমেয়েরা দিনে সত্তর থেকে একশোটা প্রশ্ন করে। গড়পড়তা বাবা-মা সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যান। উত্তর দেবার আগ্রহ থাকে না। ছোটোদের স্বাভাবিক শেখার উৎসাহকে তাঁরা আটকে দেন। তাতে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয়। ভালো শিক্ষকরা সবসময় ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেবেন। 'যে প্রশ্ন করে বেশি সে শেখে বেশি, সঞ্চয় করে বেশি'। কথাটা ফ্রানসিস বেকনের।

চলার পথে

সপ্তর্ষি আর এক দাদু

রাস্তায় যেতে যেতে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো সপ্তর্ষির। একটা বটগাছের নিচে বসে আছেন। মাথায় বড় বড় চুল। অনেক বছর আগে তার রঙ কালো ছিল। এখন পুরোপুরি সাদা। দাড়ির রঙ একই। অবশ্য দাড়ির বয়স চুলের বয়সের থেকে আঠারো বছর কম। সাদা চুল দাড়িতে বেশ লাগছে। সব বয়েসেরই সৌন্দর্য থাকে। চুল-দাড়িতে কালো রঙ করলে হয়তো বয়েস কমানো যেত, তবে চুল-দাড়ির স্বাভাবিক বর্ণের সৌন্দর্য থাকত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে : 'কেশে আমার পাক ধরেছে বটে তাহার পানে দৃষ্টি হানো কেন? / পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো আমি তাদের একবয়সী জেনো'। যাই হোক, সপ্তর্ষি বৃদ্ধকে প্রণাম করতে তিনি তাকে বসতে বললেন গাছের একটা গুঁড়ির উপর। বটগাছের নিচে রোদের তাপ নেই। বেশ আরাম। বৃদ্ধকে 'দাদু' বলল সপ্তর্ষি। তিনি একটা আপেল আর একটা মিষ্টি খেতে দিলেন। গাছের তলায় একটু বসতেই খুব ভালো লাগছিল। দাদু বললেন, 'সবসময় হাত ধুয়ে খাবে।' পাশেই ঝরনা। সপ্তর্ষি হাত-পা-মুখ ধুয়ে এলো। তার সাইকেলটা দেখিয়ে দাদু বললেন, 'তোমার ওই বাহনের যত্ন করবে। আর নিজেকেও যত্নে রাখবে।' কিছুক্ষণ কথা বলার পর দাদু বললেন, 'একটু সময় জিরিয়ে নেওয়া হলো তোমার। এবার বাড়ি ফিরবে। তোমাকে একটা কথা বলছি মনে রেখো— কি-কেন-কীভাবে-কখন-কোথায়-কে। এই ছটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।' দাদুকে আবার প্রণাম করে সাইকেলে চাপল সপ্তর্ষি।

প্রশ্নবাণ

১. জাতীয় বিজ্ঞান দিবস কবে?

২. ব্যঙ্গচিত্রী আর কে লক্ষ্মণের পুরো নাম কি? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে? তাঁর দাদার নাম কি? তিনি কিজন্যে বিখ্যাত? কোন্ ভাষায় লিখতেন?

৩. জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ও মৃত্যু কবে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম-মৃত্যু? দু'জনেই শ্রদ্ধা করতেন এক সাহিত্যস্রষ্টাকে— কি নাম তাঁর?

৪. ভারতে পরিবেশ সুরক্ষা আইন কবে থেকে চালু হয়েছে?

৫. ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কিজন্যে দরকার?

উত্তর- ১. ২৮ ফেব্রুয়ারি। ২. রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী লক্ষ্মণ। ২৪ অক্টোবর ১৯২১, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫, আর কে নারায়ণ। সাহিত্যিক, ইংরেজি। ৩. ১৮৫৮-১৯৩৭। ১৮৬১-১৯৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. ১৯৮৬। ৫. পরিবেশ উন্নয়ন।

ফিরে পড়া

দামোদর শেঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি
আনবে কটকি জুতো মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?

চিনে বাজারের থেকে এনো তো করমচা
কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
নাহয় খরচ হবে, মাথা হবে হেঁট কি?

মনে রেখো বড়ো মাপে করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়, তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়া ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কী!

বিক্রি হয়ে যাওয়া তিনটি মেয়ের কাহিনি

সুতপা বসাক ভড়

তখন উত্তরপ্রদেশের একটি শহরতলিতে থাকি। একদিন দুপুরে হঠাৎ একজন মহিলার গলা। পূর্ববঙ্গীয় টানে বাংলায় হাউমাউ করে কেঁদে ডাকাডাকি করছে গেটের বাইরে থেকে। বেরিয়ে দেখি বছর চল্লিশের এক বাঙালি বউ। দেখে মনে হল বাড়ি বাড়ি কাজ করে। আটপৌরে করে বাঙালিদের মতো শাড়ি পরা। শুনলাম আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। একে বাঙালি, তার ওপর পূর্ববঙ্গীয়, সুতরাং আমার দুর্বলতা এল মহিলার প্রতি। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলাম। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং এখন উত্তরপ্রদেশে আসার কারণ শুনলাম। পূর্ববঙ্গে বাবা-মা আর অনেক ভাইবোনের সংসার। খুবই গরিব। খাওয়া-পরার সঙ্কুলান হয় না। অল্প বয়সেই বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেয়। শ্বশুরবাড়িও খুব গরিব। এ যেন গরম কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনানে এসে পড়া। কয়েকবছর পর একটি মেয়ে হয়। ইতিমধ্যে বাড়িতে তার এক জামাইবাবুর আনাগোনা শুরু হল।

স্বামীর ইচ্ছায় কলকাতা দেখার জন্য জামাইবাবুর সঙ্গে একদিন সকালে স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে মেয়ে নিয়ে নদী পেরিয়ে পৌঁছল হাসনাবাদ। সেখান থেকে কলকাতা। এটুকু মনে করতে পারল, জামাইবাবু তাকে বেহালার মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে একটি বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। সারাদিন মা-মেয়ে কাজ করে। বিনিময়ে খাওয়া-থাকা। টাকাপয়সার কোনো প্রশ্নই নেই। জামাইবাবুটি মাঝেমধ্যে দর্শন দেন আর মুখবন্ধ রাখার হুমকি দিয়ে বাড়ির মালিকের থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়।

একদিন দুপুরে আবার জামাইবাবুর উদয় হয়। সেদিন বেশ সদয়। এই কাজ থেকে ছুটি নিয়ে মা-মেয়েকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাবার নাম করে কালিম্পঙে নেমে একজন লোকের কাছে তাকে ও মেয়েকে রেখে জামাইবাবু বেপাত্তা হয়ে যায়। ওই লোকটি জানাল যে, সে মা-মেয়েকে টাকা দিয়ে কিনেছে, সুতরাং তার মর্জিমত তাদের থাকতে হবে। বেশ কয়েকমাস ওই লোকটির কাছে থেকে অসহ্য অত্যাচারিত হবার পর তারা আবার হাতবদল হল কয়েকবার। এইভাবে অবশেষে উত্তরপ্রদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছল। সেখানে এক নিষ্কর্মা লোকের কাছে তাদের আবার বিক্রি করা হল।

নিষ্কর্মা হলেও লোকটি কিন্তু নির্বুদ্ধি নয়। মেয়েটি ততদিনে বছর পনেরোয় পা দিয়েছে। লোকটি প্রথমেই নিজের গ্রামের একজন খুনির কাছে মেয়েটিকে বিক্রি করে দেয়। দুবার দুটি বিয়ে করা বউকে খুন করেছে এমন মানুষের হাতে ওই মেয়েকে বিক্রি করে তাদের তৎকালীন মালিক।

শান্তস্বভাবের সে মেয়েটিকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

অঙ্গনা

মাঝে-মাঝে মা-মেয়ে আসত, গল্প করত। হাসনাবাদের এক ঠিকানায় চিঠি লেখার অনুরোধ করত কখনও কখনও। ইতিমধ্যে তার আরও তিনটি ছেলে হয়েছে। একদিন দেখি সে পাগলির মতো চিৎকার করতে করতে রাস্তায় ঘুরছে। ওর মেয়েকে যার কাছে বিক্রি করেছিল সে পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলেছে। শুনে আমার হাত পা অসাড় হয়ে গেল। ভাবতে পারছিলাম না কোন যুগে আছি। মেয়ে খুন হলো কিন্তু কারুর শাস্তি হল না। শুনলাম পুলিশ এসেছিল—সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ছায়া যথারীতি লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে আর কেঁদে বেড়ায়।

দ্বিতীয় ঘটনা, বর্ধমানের কোনো একটি গ্রামের মেয়ে বিক্রি হয়ে আসে একই গ্রামে। অপদার্থ, মাতাল এক যুবক কম টাকায় তাকে কিনে এনে বিয়ে করে। দু'টি সন্তানের জন্ম হয়। তারপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশি কাজ করতে পারত না। রোজ বরাদ্দ ছিল মারধোর। একদিন ওষুধ কিনে দিতে চাইলাম, কিন্তু ওর শাশুড়ি বলল, 'টাকাটা আমায় দাও, সংসারের খরচ হবে।' মাসখানেকের মধ্যেই মারা যাবার খবর পেলাম। গ্রামের লোকে বলল, মেরে ফেলেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এক্ষেত্রেও কোনো শাস্তি হল না দোষীদের। উলটে বলেছে, 'পয়সা হাতে এলে আবার বাঙালি মেয়ে এনে বিয়ে দেবো ছেলের।'

তৃতীয় ঘটনাটিও উত্তরপ্রদেশের। প্রথমে তারা ছেলের বিয়ে দেয় পশ্চিম বাংলা থেকে কিনে আনা (দালাল মারফত) মেয়ের সঙ্গে। তার কপালেও ছিল শুধু মারধর আর হাড়ভাঙা খাটুনি। তারপর একদিন শোনা গেল বউকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওর অকালমৃত্যুতে খুবই কষ্ট পেয়েছি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলির সাক্ষী আমি। ওদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছু করতে পারিনি। তাই সমাজকে সচেতন করার জন্য ঘটনাগুলি জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করেছি। শিক্ষিত সমাজ জানেও না যে এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে। গরিব মা-বাবা অন্য রাজ্যের এমনসব লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, যাদের আর্থিক সঙ্গতি ও স্বভাবচরিত্র কোনোটাই ভালো নয়। তারা নিজেদের সমাজে বিয়ের জন্য ভালো মেয়ে পায় না। তারা একটু টাকা জমিয়ে যায় বাংলায়। দালালরা আগে থেকেই গরিব কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা-মার সঙ্গে টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যবস্থা করে রাখে। ওই কিনে আনা মেয়েদের নিজেদের সমাজে বউ হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাদের পশুর মতো খাটিয়ে মেরে ফেলে। এইসব বিক্রি হয়ে যাওয়া মেয়েদের আর কোনোদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না।

সভ্যসমাজে এই যে কুপ্রথা চলছে, এটা কি বন্ধ করা যায় না? দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের বাংলার মেয়েদের প্রতি যে অবিচার চলছে তার কি শেষ নেই? গ্রামবাংলার বাবা-মায়ের প্রতি আমার নিবেদন, তাঁরা যেন কেউ না জেনে, না খোঁজখবর নিয়ে অন্য রাজ্যে মেয়েদের বিয়ে না দেন। মনে রাখতে হবে— বিয়ের নামে আপনাদের মেয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ■

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

ভারতীয় সংবিধানের হিন্দুত্বনিষ্ঠ আত্মা

গত ২৬ জানুয়ারি ৬৬তম গণতন্ত্র দিবস মহাসমারোহে পালিত হওয়ায় ভারতবাসী দেশের এই গৌরবময় যাত্রায় মনে-প্রাণে গর্ব অনুভব করেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে গণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভারতবাসী এবার গণতন্ত্র দিবসের পুণ্যক্ষণে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছিলেন। স্বাধীনতার পর আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেমন দেখেছি, যুদ্ধের করাল ছায়াও দেখেছি। দুর্ভিক্ষ দেখেছি, আবার সবুজ বিপ্লবও দেখেছি এই চোখেই। পৃথিবীর মধ্যে ভারত এমন একটি দেশ যে গণতন্ত্রের যাত্রাপথে কিছু সময় বাধা এলেও তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। আণবিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার

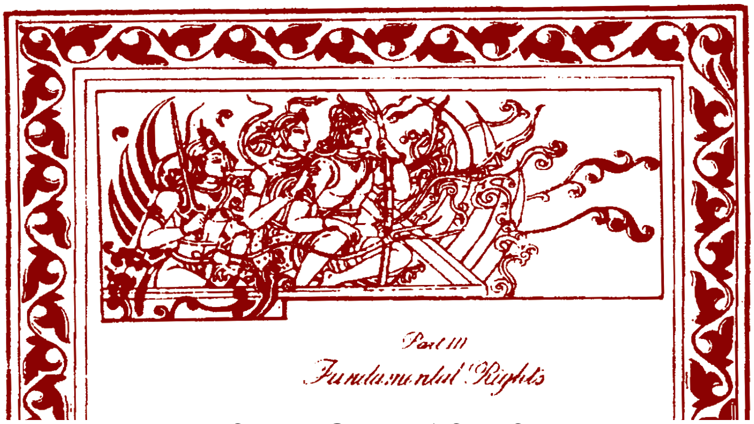

সংবিধানের তৃতীয় খণ্ড : মৌলিক অধিকারসমূহ—
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অযোধ্যায় ফেরার ছবি।

পর আজ মঙ্গলগ্রহেও সে পা রেখেছে। এজন্য আমরা ভারতবাসী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা ও আমাদের দেশ গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি। এই মরণপণ সঙ্কল্প আমরা ছাড়বার পাত্র নই। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তারা কতখানি স্বাধীন তার আত্মসমীক্ষা তাদেরই করতে হবে। তারা সন্ত্রাসবাদকে পুষ্ট করতে কেন এত উৎসাহী? এর জন্য কি তারা নিজেরাই দায়ী নয়? এবিষয়ে তাদের ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। যদি এই সুন্দর পৃথিবী নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য তাদের সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারাই দায়ী হবে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর যখন আমাদের দেশের বিকাশ করার জন্য তৎকালীন নেতা ও মনীষীগণ সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখন তাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যয়ন শুরু করেন। ভারতের জাতীয় পতাকাতলে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশ যে দর্শন ও আদর্শের জন্য বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, সেগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য তাঁরা সর্বান্তকরণে যত্নশীল হয়ে ভারতের সংবিধান রচনা করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সেই সংবিধান গৃহীত হয়। পরে আবশ্যকতা অনুসারে সংশোধনও হয়ে চলেছে। সমস্যার বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার অনেক দিক থাকতে পারে, কিন্তু সমাধান সংবিধানের 'আত্মা'কে কেন্দ্র করেই হওয়া উচিত। যদি এই 'আত্মা'কে কেবলমাত্র একটি বাক্য হিসেবে দেখা হয়, তবে হিন্দু দর্শনের অতিরিক্ত কোনো প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক শব্দ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যখন এই বাক্যগুলির অবমাননা হতে শুরু করে তখন অনিবার্যভাবে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এই একটি বিষয়, যখন কিছু কথা নিয়ে দেশে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিচার বিশ্লেষণ হতে শুরু করে, তখন সবাই নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা কেবল তা রচনা করেননি, বরং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলির চিত্রও প্রকাশিত করেছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর জন্য আমরা যতই লাফালাফি করি না কেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ভাবধারাকে যতই সমালোচনার কেন্দ্র তৈরি করি না কেন, কখনো তাকে অস্বীকার করা যেতে পারে না।

কিছুদিন আগে গীতার মতো একটি শ্রেষ্ঠ ও অবিতর্কিত গ্রন্থ নিয়েও অসার রাজনীতির কচ্‌কচানি শুরু হয়েছিল। তখন একটি কথা মনে হয়েছিল যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে যে লড়াই করেছিলেন, তা আমরা কি ভুলে গেছি? অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য অস্বীকার করছি? গণতন্ত্রে কোনো একটি দলের কাছে রাজসত্তা সবসময় থাকতে পারে না। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন তারা প্রশাসনের প্রশংসক থাকে, কিন্তু যখন ক্ষমতাহীন হয় তখন সেই প্রশাসনতন্ত্রকে আর সম্মান প্রদর্শন করে না। এটা কোনো লুকোনো কথা নয় যে, ভারত একটি হিন্দুরাষ্ট্র, হিন্দুত্বই ভারত-সংস্কৃতির আত্মা এবং হিন্দু ভারতের জাতিগত পরিচয়। ওই স্বর্ণিম আদর্শকে আমরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকি মাথায় করে রাখি, ক্ষমতাচ্যুত হলে আবার তার খোঁজ করতে থাকি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুদর্শনের

ভিত্তিতে দেশের মানুষকে সংগঠিত করেছিল, আন্দোলন চালিয়েছিল ও অনেক কষ্টও করেছিল। ক্ষমতাচ্যুত হতেই তারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, নিজেদের মনগড়া বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক বলে চিৎকার করতে শুরু করে। তখন প্রয়োজন পড়ে সংবিধানের 'আত্মা'কে মনে করিয়ে দেওয়ার। যা আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রনেতা ও মনীষীরা স্বাধীনতার পর দেশকে সমৃদ্ধ ও পরিচালনা করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে আমাদের সংবিধানের সেই বিষয়গুলিকে দেশবাসীর গোচরে আনা। আজকের স্বার্থান্বেষী ও অদূরদর্শী রাজনীতিকরা মনগড়া ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য দেশবাসীকে সচেতন করা ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার করা কি অপরাধ হবে? আমাদের প্রাচীন নিদর্শন, আমাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্থান ও চিহ্ন, আমাদের সংস্কৃত ভাষা, জীবনপদ্ধতি, আর্থিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা উৎপন্ন করা কি রাষ্ট্রবিরোধী বলে প্রতিপন্ন হবে? এসব বিষয়ে যাতে কণামাত্র বিভ্রান্তি না উৎপন্ন হয় তার জন্য সংবিধান নির্মাতারা শুধু শব্দের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে একেবারে চিত্র-সহ সংবিধানের পাতায় পাতায় তা সন্নিবিষ্ট করেছেন। এজন্য সংবিধানের সেই পৃষ্ঠাগুলি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। এর ফলে দেশবাসী নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে এসব বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, সত্যমিথ্যা যাচাই করে নিতে পারবেন এবং স্বার্থান্বেষী নেতাদের দুরভিসন্ধি ধরে ফেলতে পারবেন।

এজন্যই সংবিধান সভার সমস্ত সদস্য একমত হয়ে সংবিধানের একটিই ভাগে কিছু ঐতিহাসিক চিত্র ও তৎসম্পর্কিত বিবরণের সমাবেশ করেছেন। এই বিবরণগুলি রামপুরের প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা কেবল পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে ভগীরথের মতো একটি অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১৯৫০ সালে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক কাজটি করেছিলেন। সংবিধানের এই হস্তলিখিত পৃষ্ঠাগুলি দেশের মধ্যে সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য বিখ্যাত শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু চার বছর পরিশ্রম করে সম্পন্ন করেন। সংবিধানে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি মহেঞ্জোদড়ো এবং বৈদিককাল থেকে শুরু হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত ঘটনাবলির সমাবেশ। এই কাজ স্বয়ং জওহরলাল নেহরুর আগ্রহে করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারে চিত্রগুলি সোনার ফ্রেমে মোড়া হয়েছে। এই ঐতিহাসিক কাজের জন্য নন্দলাল বসুকে ২১ হাজার টাকা পারিশ্রমিক রূপে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র ও বিবরণ ২২১টি পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য সংবিধানসভা ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে অর্পণ করে। সংবিধানের মূল গ্রন্থ চিত্র ও বিবরণ-সহ নতুনদিল্লীর সংসদ ভবনে একটি স্টিলের বাক্সে সংরক্ষিত আছে। বিজ্ঞানভিত্তিতে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতে আদিকাল থেকে সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ বিদ্যমান। অতীতে এইসব কথার জন্য কেউ অথবা কারো সংস্কৃতি বিপদের মধ্যে পড়েনি। আজ যদি কেউ অথবা কোনো সংগঠন সেই পরম্পরায় নিজের ভাবনা ব্যক্ত করে তাহলে অন্যের ধর্ম ও সংস্কৃতি কীভাবে বিপদে পড়বে? ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং এসব বিষয়কে হিন্দুত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে কেবল প্রশংসাই করেননি, বরং অগাধ বিশ্বাস ও প্রগাঢ় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। তাহলে একই বিষয়ে যখন কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির বদনাম করতে লেগে যায় তখন তা দুশ্চিন্তা ও ভাবনার বিষয় হয়ে পড়ে।

সংবিধান প্রণেতারা এমন অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির দিকগুলি যুক্ত করেছিলেন। এজন্য যে আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর এত বিকাশ হয়েছে যে, আজ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে মহাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। এখন যদি কেউ এই আদর্শবাদ ও শক্তিশালী নেতৃত্বকে সহ্য করতে না পারে, তাহলে কার দোষ? হিন্দু-সংস্কৃতিকে তো দোষ দেওয়া যায় না। অতীতেও সে মহান ছিল এবং আজ আবার বিশ্বগুরু হওয়ার পথে অগ্রসর। আমাদের সংবিধানের এই অংশকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও উৎসাহের পরিবেশ নির্মাণ করা প্রত্যেক দেশভক্ত নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যদি সরকার স্বয়ং সংবিধানের এই পৃষ্ঠাগুলি পুস্তিকারূপে প্রকাশিত করে দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করে তাহলে এসব ভ্রান্তির নিরসন হতে পারে। ■

চিত্র ও বিবরণের সূচী

১) মহেঞ্জোদড়োর সময় ও মহেঞ্জোদড়োর সিলমোহর, (২) বৈদিককালের গুরুকুলের দৃশ্য, (৩) মহাকাব্যযুগ— শ্রীরামের লঙ্কা বিজয় দৃশ্য। শ্রীরাম ও সীতা, (৪) শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশ দান অর্জুনকে, (৫) মহাজনপদ এবং নন্দযুগ, ভগবান বুদ্ধের জীবনচিত্র, (৬) মহাজনপদ এবং নন্দযুগ, ভগবান মহাবীরের জীবনচিত্র, (৭) মৌর্যযুগ, ভারতে ও বিদেশে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দৃশ্য, (৮) গুপ্তযুগের শিল্পকলার দৃশ্য, (৯) গুপ্তযুগের বিক্রমাদিত্যের বিচারালয়ের দৃশ্য, (১০) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্য, (১১) মধ্যযুগের ওড়িশার শিল্পকলার দৃশ্য, (১২) মধ্যযুগের নটরাজমূর্তি, (১৩) মধ্যযুগের মহাবলীপুরম্ শিল্পকলার দৃশ্য, (১৪) মোগল আমলের আকবরের চিত্র ও মুঘল শিল্প, (১৫) মোগল আমলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ও গুরু গোবিন্দ সিংহের চিত্র, (১৬) বৃটিশ আমলে টিপু সুলতান ও রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের চিত্র, (১৭) মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযানের দৃশ্য, (১৮) গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার দৃশ্য, (১৯) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্য দেশভক্তের ভারতের বাইরে স্বাধীনতা-প্রয়াসের চিত্র। (২০) হিমালয় পর্বতমালার দৃশ্য, (২১) থর মরুভূমির দৃশ্য, (২২) গঙ্গাসাগর, সিন্ধুসাগর ও হিন্দু মহাসাগরের দৃশ্য।

বাজার অর্থনীতি ও অর্থনীতিতে বাজার অভিমুখ কোন দিকে

অম্লানকুসুম ঘোষ

স্বতঃচালিত যে কোনও বিষয়ের মতো অর্থনীতিরও একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ বর্তমান। নিয়ন্ত্রিত বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই সেই অভিমুখ বাজারকেন্দ্রিক। অর্থাৎ পণ্য বা পরিষেবা যেখানে বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারীর

নরেন্দ্র মোদী

কাছ থেকে ক্রেতা ও পরিষেবা গ্রহণকারীর কাছে পৌঁছয়, সেই বিন্দুটিই হয়ে ওঠে উৎপাদক থেকে উপভোক্তা, অর্থনীতির সকল শক্তির একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতিতে সেই বাজারের সম্ভাব্য অবস্থানকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত ও তত্ত্বগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জেনারেল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে। অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মেধাস্তরে যুযুধান দু'পক্ষের মধ্যে কে কতটা ঠিক তার একটা তুলনামূলক আলোচনার আসা যাক।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হলো 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। অর্থাৎ ভারতে পণ্য উৎপাদন করে তা বিশ্ববাজারে রপ্তানি করা। এতে ভারতীয় শ্রমিকের হাতে কাজ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় দুই-ই বৃদ্ধি পাবার কথা। পক্ষান্তরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জেনারেলের বক্তব্য ভারতের লক্ষ্য হওয়া

বর্তমানে গোটা বিশ্বের অর্থনীতির মাত্র ৩ শতাংশ ভারতের দখলে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলেও প্রথম তিন অর্থনৈতিক শক্তি আমেরিকা, চিন ও জাপানের তুলনায় ভারত এখনও নগণ্য। তাই নিজের বাজারের ওপর ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা এখন বাতুলতা মাত্র।

উচিত 'মেক ফর ইন্ডিয়া'। যাতে ভারতীয় শ্রমিকরা বিদেশি বাজারের পরিবর্তে ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল থাকে ও আন্তর্জাতিক বাজারের আকস্মিক বিপর্যয়ের প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে না পড়ে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে উভয় যুক্তির সারবত্তা আলোচনা করা যাক।

কেন্দ্রীয় সরকারের অভীপ্সিত পথ রপ্তানি-নির্ভর, এতে রপ্তানি বাড়বে, ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক ঘাটতি (current A/c deficit) হ্রাস পাবে। এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার ফলে দেশবাসীর মাথাপিছু গড় আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এতে সামগ্রিকভাবে ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটবে। ফলে চাহিদা বাড়বে ও অর্থনীতির পুনরায় বৃদ্ধি ঘটবে, যা নতুন করে বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার জন্য দেবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি চক্র সৃষ্টি হবে। চক্রটি এইরূপ : কর্মসংস্থান সৃষ্টি--- আয়বৃদ্ধি--- ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি—চাহিদা বৃদ্ধি—উৎপাদন বৃদ্ধি—নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি—পুনরায় আয়বৃদ্ধি—। উপরিলিখিত চক্রে একবার সামিল হতে পারলে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়া ভারতের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এবারে দেখা যাক এর সম্ভাব্যতা কতটা। প্রথমত, ভারতের সস্তা শ্রম বরাবরই বিদেশিদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তথ্যপ্রযুক্তি ও বায়োটেক গবেষণা থেকে

রাজন

শুরু করে সাধারণ কায়িক শ্রমের কাজ পর্যন্ত সবকিছুতেই তাই এখন ভারতীয় কর্মীদের পাশ্চাত্যে গমন বা পাশ্চাত্যের কাজ ভারতীয়দের দিয়ে করানোর রীতি বর্তমান। এতে নিয়োগকারী সংস্থার যেমন অর্থনৈতিক সুরাহা হয় তেমনই নিযুক্ত ভারতীয় কর্মীরও কর্মসংস্থান বা উন্নততর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। কিন্তু আউট সোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী সংস্থার দেশের সরকার বাধা দিতে পারে ও সেদেশের শ্রমিকদের কথা ভেবে বাধা দেয়ও এবং ভারতীয় কর্মীদের নিয়োগকারীর দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিবাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই বহু সংখ্যক কর্মীর

বিদেশাভিমুখে গমন ঘটলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য-ই থাকে। আবার বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় কর্মীরা সেখানকার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় থাকতে বাধ্য হয়ে ভারতের মতো সস্তায় শ্রমবিক্রয় করতে অপারগ হয়, ফলে নিয়োগকারী সংস্থার কাঙ্ক্ষিত লাভ হয় না। এই সমস্যাগুলির সমাধান হয় যদি নিয়োগকারী সমস্যাগুলি তাদের পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করে ভারতেই তাদের নির্মাণকেন্দ্র গড়ে তোলে, তাহলে ভারতেও লগ্নির বন্যা আসবে আর নিয়োগকারীরাও লাভ করবে প্রচুর। এক্ষেত্রে সুবিধা আরও আছে, আয়কর ও অন্যান্য নানা খাতে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। সরকার সেই বর্ধিত আয়ের দ্বারা নিজের আয়-ব্যয় ঘাটতি (Fiscal deficit) কমাতে পারে আবার পরিকাঠামোগত উন্নয়নও করতে পারে। পরিকাঠামোর উন্নয়নে জাতীয় উৎপাদন আরও বাড়বে, ফলে সরকারের আয়ও বাড়বে, ফলে আবার পরিকাঠামোর উন্নয়ন, অর্থাৎ আরেকটি উন্নয়ন-চক্র। চক্রটি নিম্নরূপ : বিদেশি লগ্নি বৃদ্ধি---জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি—সরকারের আদায় বৃদ্ধি—পরিকাঠামো উন্নয়ন— জনসাধারণের পুনরায় আয় বৃদ্ধি— সরকারের পুনরায় আয় বৃদ্ধি— পরিকাঠামোর পুনরায় উন্নয়ন। অর্থাৎ মেক ইন ইন্ডিয়ার দ্বারা ভারত দু'ধরনের উন্নয়ন চক্রে সওয়ার হতে পারছে।

পক্ষান্তরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জেনারেল বলেছেন, বৈদেশিক বাজারের অনিয়মিত ব্যবহারের কথা। অর্থাৎ বিদেশি বাজারের ক্রেতাদের বা বিদেশের জনসাধারণের আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাদের আয় বৃদ্ধি পেলে ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় আবার তাদের আয় হ্রাস পেলে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে তখন ভারতে কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে, এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁর পরামর্শ 'মেক ফর ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতের বাজারের জন্য নির্মাণ করা। তাতে দেশের বাজারের ওপর নির্ভরশীল থাকায় বিদেশি বাজারের উত্থান-পতন ছায়া ফেলতে পারে না দেশীয় উৎপাদনের উপর। এর উদাহরণ হচ্ছে ২০০৮-এ যখন লেম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হয় তখন মার্কিন অর্থনীতির উল্কাসদৃশ পতনের ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল পঙ্গু। সেসময় কিন্তু সারা বিশ্বের মাত্র বার্ষিক ২% বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় অর্থনীতি তার বার্ষিক ৮% বৃদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনমনীয় দৃঢ়তায়। কারণ সেসময়কার ভারতীয় অর্থনীতি ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল। যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, ফলে তাতে চাহিদা-হ্রাসের ভাটার টান দেখা যায়নি, ফলে অর্থনীতিও ছিল অটুট। অতীতের এই নিরাপদ বাতাবরণের আশ্রয়ে থাকার আশাতেই রাজনের এই 'মেক ফর ইন্ডিয়া'র পথনির্দেশ। একটি তাঁতে যখন কাপড় তৈরি হয় তখন একদিকে টানা আর একদিকে পোড়েন দেওয়া হয়। এই দুইয়ের মিশ্রণে অর্থাৎ টানাপোড়েনোর ফলে একটি নতুন কাপড় তৈরি হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই যুক্তি খাটে। একদিকে বিশ্ববাজারের অধিক লাভের অনিবার্য আকর্ষণ বা টান, আরেকদিকে দেশীয় অর্থনীতির নিরাপদ আশ্রয় বা পোড়েন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই তৈরি হবে ভবিষ্যতের সুগঠিত ও উন্নত ভারতীয় অর্থনীতি।

এখন দেখা যাক এই সংমিশ্রণের পদ্ধতি কেমন হবে? মোদী কথিত ও রাজন কথিত উভয় মতেরই ত্রুটি ও শক্তি দুই-ই বিচার করে দেখা যাক। প্রথমত, রাজনের 'মেক ফর ইন্ডিয়া' ভারতীয় বাজারের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেড়ে উঠলেও, ভারতীয় বাজার সীমাবদ্ধ চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী। ফলে 'মেক ফর ইন্ডিয়া' জাতীয় অর্থনীতির পালে খুব বেশি হাওয়া আনতে পারবে না। ফলে উন্নয়নের রথচক্রে আরোহণ করা হয়ে পড়বে অসম্ভব। আবার মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বিদেশি চাহিদায় ভর করে জাতীয় অর্থনীতির নবযুগের প্রবর্তন করবে সত্য, কিন্তু বহুধা বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সামান্য অদলবদলেই সেই উন্নয়নের সৌধ হয়ে পড়বে ধূলিসাৎ। তাই সংমিশ্রণ হওয়া উচিত এভাবে—একদিকে মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র জেরে কর্মসংস্থান, ক্রয়ক্ষমতা, চাহিদা বৃদ্ধি পাক আর সেই অভ্যন্তরীণ চাহিদার বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই তরতরিয়ে এগোক রাজন কথিত 'মেক ফর ইন্ডিয়া'। বর্তমানে গোটা বিশ্বের অর্থনীতির মাত্র ৩ শতাংশ ভারতের দখলে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলেও প্রথম তিন অর্থনৈতিক শক্তি আমেরিকা, চিন ও জাপানের তুলনায় ভারত এখনও নগণ্য। তাই নিজের বাজারের ওপর ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা এখন বাতুলতা মাত্র। কিন্তু উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দেশীয় চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধির পরে সেই বিস্তৃত দেশীয় বাজারের ওপর ভিত্তি করে ভারত সহজেই আন্তর্জাতিক উত্থান-পতনের বৃহৎ লহরীসমূহকে অগ্রাহ্য করতে পারে।

তবে এই সংমিশ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার জরুরি। রপ্তানির জন্য যেমন বিশেষ ধরনের শিল্পাঞ্চল সমূহের দরকার (তবে SEZ নয়), তেমনই অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরনের জন্য দেশের সর্বত্র শিল্পের অনুকূল পরিকাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যক। এবং কর কাঠামো এমনভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত যাতে এই দুই শিল্পাঞ্চলের মধ্যে কোনওপ্রকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

সর্বশেষে একথা অবশ্য স্মর্তব্য যে দু'রকম শিল্পের বিকাশ ও বিদেশি লগ্নির বন্যা সৃষ্টি করতে গিয়ে যেন আমরা পরিবেশকে এবং সুরক্ষাকে উপেক্ষা না করি। আরেকটি ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা যেন না ঘটে এবং শিল্পজাত বর্জ্য যাতে পরিবেশকে কলুষিত না করে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আবার অহেতুক ধর্মঘট বা শ্রমিক অসন্তোষ পরিহার্য হলেও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থও যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিকেও যেন সজাগ দৃষ্টি থাকে সরকারের। তবেই 'আচ্ছে দিন' আসবে কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনাকে দূরে রেখে এবং সামাজিক ন্যায়বণ্টনকে মাথায় রেখেই। ■

নন্দীগ্রাম ও দোনো চম্পট

শেখর সেনগুপ্ত

বেশিরভাগ বয়স্কর আক্ষেপ, ঘুম তাদের তালাক দিয়েছে। চোর-জোচ্চর বাটপার নই চিটফান্ডের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীদের মতন, তবুও দিনে-রাতে দু'চোখ এক করতে অত কাতরতা কেন? সবিনিয়ে কবুল করি, আমার কিন্তু এ আক্ষেপ নেই। বিছানা নিলেই কাদা। দুঃস্বপ্নের বয়ান-টয়ান দূরের কথা, তাদের নির্যাসটুকুও থাকে না।

তাই সেদিন ভরদুপুরে শিয়রে রাখা মোবাইলটা যখন তারস্বরে চেঁচাতে থাকে, কাঁচাঘুম চোট খাওয়ায় আমি স্পষ্টত বিরক্ত। বেশ তাগতে সেটা কানের ওপর চেপে ধরাতে ঝাপটা মারে দাপুটে গলা, 'মিঃ সেনগুপ্ত?'

—ইয়েস, শেখর সেনগুপ্ত। আপনি?

—আমি কুণাল ঘোষ।

—কোন কুণাল ঘোষ—সেই এক ফোনে এক লাখ ?

—হাঃ হাঃ হাঃ। ঠিক চিনেছেন। আমার অবশ্য আরও কিছু পরিচিতি আছে। এখন ফোন করছি 'কলম' পত্রিকার সি ই ও হিসেবে। কলম পড়েন?

—না। তবে দেখেছি।

—রবিবারের পাতার জন্য একটা গল্প চাই আপনার। সহজ সরল গল্প। বুঝতেই পারছেন আমাদের পাঠকরা আবার —

গোত্তা খেয়ে উঠে দাঁড়াই। যেন শব্দার্থেই কোণঠাসা। কিন্তু সেই সহজ সরল গল্প লিখে আর পাঠানো হয়নি। যখনই লিখতে বসেছি, আমার ব্রীড়াভরা কলম আমাকে প্ররোচিত করেছে অন্য কোনও লেখার দিকে সরে যেতে। তারপর গঙ্গা-নর্মদা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ঝোলা থেকে বেরিয়েছে কী বিকট চেহারার এক জন্তু! সারদা চিটফান্ড! কুণালবাবু থেকে আরম্ভ করে কত সব তাবড় তাবড় জন পুলিশের কালো গাড়িতে উঠছেন-নামছেন, নামছেন-উঠছেন! মিডিয়া নিজেই যেন শিহরিত।

কীসের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজব ওই প্রতারণার? উদাহরণ হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলাম নন্দীগ্রামের একটা জ্বলন্ত ঘটনাকে। এই সেই নন্দীগ্রাম---যেখানে আমাকে যেতে হয়েছিল এবং অতিবাহিত করতে হয়েছে জীবনের একটা পর্বকে। পাক্কা সাড়ে তিন বছর।

সময় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, ১৯৭৬। সারা দেশ তখন মনোমোহিনী ইন্দিরাগান্ধীর জরুরি অবস্থার শর্ট সার্কিটে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। গণতন্ত্র রামধাক্কা খেয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে। পদে পদে ইন্দিরাপ্রেমী মহামানবদের গোঁসা ও সন্দেহ। বাবু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, সাহসী বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌরকিশোর ঘোষকে এক কয়েদখানা থেকে আর এক কয়েকখানায় ঘোরাচ্ছেন।

আর ঠিক ওই সময়েই আমিও পতিত হলাম এক খুচরো বিপদে। ম্যানেজমেন্টের ফতোয়া, এবার তোমাকে বর্ধমানের পাট গুটিয়ে যেতে হবে নন্দীগ্রামে সেখানকার স্টেটব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ সামলাতে। নতুন পরিস্থিতিতে ইউনিয়নের বড় দাদাও নির্ঝঞ্ঝাটে দাদাগিরি করতে সাহসী নন। আমার কথা শুনবে কে? মাথার ওপর যিনি প্রধান আমলা, তিনিই আমার লর্ড—ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন, হয় নন্দীগ্রাম ব্রাঞ্চের চার্জ নিন, নচেৎ এমন নাস্তানাবুদ করা হবে ...।

স্ত্রীকে যখন জানালাম, উৎকণ্ঠায় থরথর করে সুডৌল চিবুকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, দু'চোখে টলটলে দৃষ্টি। কন্যার বয়স তিন বছর, পুত্র এক বছরের; খাট থেকে পড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধ পিতার ফিমার বোন দু'টুকরো। ভরসা কেবল বর্ধমান ব্রাঞ্চের দুই ডাকাবুকো অধস্তন যুবা কর্মী—কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, আমরা নদী-সাগর টপকে আপনার মালপত্তর ঠিক পৌঁছে দেব নন্দীগ্রামে ব্যাঞ্চ ম্যানেজারের কোয়ার্টারে। আপনি ফ্যামিলি নিয়ে রওনা দিন।

দু'জনই চশমা পরা রোগা; কিন্তু উৎসাহে ও অভিজ্ঞতায় টগবগে। আমি নন্দীগ্রামের ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। কেবল প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত হাসির গল্প 'I don't know' মস্তিষ্কের কোষে গেঁথে দিয়েছে নন্দীগ্রামকে। পরিজনদের কাউকে কিছু বলা অনুচিত। আত্মসংবরণই ধর্ম। এমনকী মাড়ি যে ফুলেছে দাঁতের, তারও হদিশ দিইনি দু'বেলা পেইন কিলার খেয়ে।

বর্ধমান থেকে হাওড়া। হাওড়ায় ট্রেন বদলে মেচেদা। সবটাই লোকাল ট্রেনে। ঢিমে-তালে চাকা ঘোরে। কেটে গেল সাড়ে চার ঘণ্টা। মেজাজকে চড়ায় উঠতে দেই নি। যেটুকু কথা বলছি, সবটাই যেন স্বগত-ভাষণ। মেচেদায় নেমে দরাদরি করে একটি ম্যাটাডোর টাইপের চার চাকার সঙ্গে রফা করলাম। সেই গাড়ি লাফাতে লাফাতে এমন ছুটল যে বাচ্চা দুটো সমেত আমরা সকলে কম-বেশি কাহিল।

যেখানে হলদি নদী মিশেছে সাগরে। —ছবি : লেখক (সময় ১৯৭৬)

তারই মধ্যে আমার স্ত্রী হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সুজির পায়েস ও ওভালটিন। মালপত্তর নেহাৎ কম তো নয়। ঢাউস স্যুটকেস, খাবারে ঠাসা টিফিন ক্যারিয়ার, মস্ত হোল্ডঅল, বাবার সিংহ-মাথা পোক্ত ছড়ি...। এদের ওপর যে যেমন পারছি, গুছিয়ে বসে বা শুয়ে আছি। মাথার ওপর খোলা নীল আকাশ। হু হু হিমেল বাতাসের ঝাপটা। সকলেই অধীর—কখন পৌঁছব নন্দীগ্রাম? কান-গুটানো বাঁদর-টুপি মাথায় বসিয়ে চারদিকে দেখছি এবং বিলক্ষণ টের পাই, নতুন জায়গায় গিয়ে আমায় হয়তো আমূল বদলে যেতে হবে। তমলুক পার হচ্ছি। বাবা বললেন, 'তমলুকের বর্গাভীমা মায়ের মন্দিরে একবার আমাকে নিয়ে আসবি। মা এখানে খুব জাগ্রত।'

নন্দকুমার পার হলাম। এখানে হলদি নদীর ওপর পাকা ব্রিজ আছে। কাঁথি ছুঁয়ে দীঘা যাবার হ্রস্ব পথ। নন্দকুমার পার হয়ে মহিষাদল। বড়সড় রাজপ্রাসাদ। তখনও কালের ছোবল এড়িয়ে মহিমান্বিত। এখানকার কলেজও বিখ্যাত। বেশ কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। মহিষাদলের পর বাঁকা পথে তেরাপেখ্যা। এখানেই মালপত্তর সমেত আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল চার চাকা। হলদি নদী। এই নদী পার হয়ে তবেই পা রাখা যাবে নন্দীগ্রামে। পড়তি বেলা। নদীতে তন্দ্রাভাব। অথচ এটা প্রায় মোহনা। খানিক অগ্রগামী হলেই সাগর। একদিকে হলদিয়া বন্দর। অন্যদিকে নন্দীগ্রাম। তখন হলদিয়ার নেহাৎ শৈশবকাল। আর হলদিয়াও নন্দীগ্রামের মাঝে নদীর বুকে তখনও মাথা তোলেনি নয়াচর।

সূর্য পশ্চিমে। কী উপায়ে নদী পার হবো পরিজন ও মালপত্র নিয়ে, ভাবতে গিয়ে মাথার চুল খাড়া। তখন ভাটার কাল। সামনে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে থক থক করছে কালো গভীর পলি। পা ফেললে শরীরের হাঁটু অবধি তলিয়ে যাবে নিশ্চিত। নদীর কিনারে খান তিনেক নৌকা। যাকে বলে প্রিমিটিভ বোট। একটিতেও মটোর লাগানো নেই। দাঁড় ও বইঠাই ভরসা। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে, ঈশ্বর জানেন। জোয়ার তো আর অতর্কিতে আসে না। আমাদের দেখে দুই সুপুষ্ট চেহারার পারানি সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা জানাল, ভাটার সময় যাত্রীদের কোলে তুলে নিয়ে নৌকায় গিয়ে বসানোটা এখানকার হরবখত রীতি। পার হেড দক্ষিণা মাত্র পঁচিশ পয়সা। খাসা বন্দোবস্ত। বাবা প্রীত হলেন। যেন তার শিশুকাল ফিরে এসেছে। একমাত্র আমার স্ত্রী ওই সেবা গ্রহণে অসম্মতি জানায়। সে বিস্তর পলি-কাদা মেখে নৌকায় গিয়ে ওঠে। আমরা আর সকলে পৌঁছলাম কোলে চড়ে। ততক্ষণে পশ্চিমাকাশ ফাগরক্তিম। বিস্তীর্ণ, মুক্ত, শান্ত, শালীন নিরিবিলি নদী পার হচ্ছি। কোথাও দৈন্য, আবর্জনা, দুর্গন্ধের লেশমাত্র নেই। এটাই ছিল সেই সময়ের নন্দীগ্রামে পা রাখবার একমাত্র পথ।

ব্যাঙ্কব্রাঞ্চের ওপর বড়সড় কোয়ার্টার। কিন্তু কোথাও বিদ্যুৎ নেই। তেরো কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক ওষুধের দোকান থাকলেও একজন ডিগ্রিধারী ডাক্তার নেই। অথচ শিক্ষার হার উঁচুতে। একটি কলেজ, দুটি হাইস্কুল, প্রকাণ্ড খেলার মাঠ, একটি মস্ত রাম-সীতার মন্দির, এমনকী জেনারেটার চালিত সিনেমা হলও মজুদ। সাড়ে তিন বছর অবস্থানের সুবাদে নন্দীগ্রাম এক সময়ে ছিল আমার নখদর্পণে। ঘনিষ্ঠদের তালিকাও বড়। বিপ্লবী রাজনীতিবিদ সুশীল ধাড়া, ভারতীয় জনতা দলের একনিষ্ঠ কর্মী অরূপ বেরা, পরবর্তীকালের দুই বিধায়ক শক্তি বল (সি পি আই) ও দেবী পাণ্ডা (কংগ্রেস), বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুকুমার পাহাড়ি, সুপরিচিত গায়ক, শুভেন্দু মাইতি, কবি অমিতাভ দাশ, কবি অনুরাধা মহাপাত্র, কবি-সাংবাদিক শোভন মহাপাত্র...। সকলের সঙ্গেই আমার ওঠা-বসা। সুযোগ পেলেই ঘুর-ঘুর। নদীর পাড় ধরে সাগর সন্ধানে। আর ইতিহাসকে হাতড়ানো।

এইভাবে হাতড়াতে হাতড়াতেই পেয়ে গেলাম এক সাংঘাতিক প্রতারণার ইতিবৃত্ত—যার সঙ্গে অথ 'সারদা' কেলেঙ্কারির বিলক্ষণ সাদৃশ্য। সেই তথাকথিত পুলিশ ও প্রভাবশালীদের আঁতাতে গরিব ও নিম্নবিত্তের রক্তশোষণের মৌরুসীপাট্টা।

সময় ১৯০১। নন্দীগ্রামে গোপালভাট নামক এক ভদ্রবেশী ঠগ তাঁর শাকরেদ ও প্রভাবশালী চোট্টাদের নিয়ে একটি অভিনব কারবার ফেঁদেছে। ভাটের খেলায় বৈশিষ্ট্য ছিল সপ্তাহের প্রথমে তার এজেন্টদের মাধ্যমে যে যত টাকা ফান্ডে এসে জমা দেবে সেই ব্যক্তি এক সপ্তাহ বাদে কাগজ দেখিয়ে ফেরত পাবে দ্বিগুণ টাকা। কিছুদিন এ রকম চলবার পর গরিবদের আস্থা খুব বেড়ে যায়। আস্থা বৃদ্ধি পাবার আর একটি কারণ, দারোগা রাইমোহন ঘোষ সমেত বাঘা বাঘা প্রভাবশালী যথা বিশ্বনাথ জানা, রাজনারায়ণ পড়ুয়া, চিন্তাহরণ পণ্ডা, সুদেব বাঙ্গাল প্রমুখ জোর কীর্তন গেয়ে চলেছেন গোপাল ভাটের কারবারের স্বপক্ষে। আসলে এঁরা সকলেই ভাটের কাঁধে বন্দুক রেখে আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। যথাক্রমে কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেলে এঁদের অনেকেই নিপাত্তা হয়ে যান। তখনকার দিনে তো আর সি বি আই ছিল না যে দুর্গম লোকেশন থেকেও একেকখানা ঠগবাজকে ঠিক ধরে এনে আলোর সামনে বসাবে। বরং খোদ দারোগা রাইমোহন ঘোষ পালাতে সাহায্য করেছিলেন কালপ্রিটদের। পরে ধরা পড়েন সুদেব বাঙ্গাল, ধরণীধর বল, বেসরৎতুল্লা, বিশ্বনাথ জানা, রামনারায়ণ পড়ুয়া, কালিপ্রসাদ গিরি, চিন্তাহরণ পণ্ডা, দুর্গাপ্রসাদ লাল এবং কামদেব ভূঞ্যা। কেস চলাকালে ধরণীধর বল রাজসাক্ষী হয়ে যান।

প্রতারিত মানুষদের হাহাশ্বাস বাতাসকে ভারী করে তোলে। ক্রমে সেই হাহাকার পুঞ্জীভূত মেঘের সৃষ্টি করে। মানুষ আর গুম মেরে বসে থাকল না। হাজার হাজার ক্রোধী নর-নারী ছুটে যায় থানা আক্রমণ করতে। কারণ দারোগার তদারকিতে থানায় তখন খাঁচায় পোরা বাঁদরের মতন বসে আছে গোপাল ভাট। হল্লা শুনে সে পিছনের দরজা দিয়ে পালায়। দারোগা রাইমোহন বন্দুক ও লাঠি দিয়ে উত্তাল জনতাকে গতিরুদ্ধ করবার বৃথাই চেষ্টা করলেন। উন্মত্তপ্রায় জনতা দারোগাকে ধরে খড়ের গাদায় ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসার রাইমোহন ঘোষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

নন্দীগ্রামের ইতিহাসে এটা হল একটি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় ঘটনা। গোপালভাটের সেই সারদাপ্রতিম প্রতারণার নাম 'দোনো চম্পট।' অর্থ হল, আসল ও সুদ' দুটোই খতম।

মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতাম হলদি নদীর ধারে। একদিন এক মাঝির গলায় শুনতে পেলাম সেই গান ঃ

কি খেলা খেলিলে গোপাল নন্দীগ্রামের বাজারে
খেলার দাপে গুমগড় কাঁপে, রাইমোহন পুড়ে মরে কুটাগাদার ভিতরে।
খেলার নাম চম্পট দোনো-বাঁধা কাপড় গহনা
একগুণ দিলে দ্বিগুণ মেলে তাই জমা দিল ঘরে ঘরে।

আমি কান পেতে আছি, কবে 'সারদা'কে নিয়ে এরকম আর একটি গান শুনতে পাব।■

অন্য রকম

৯০ বছরের স্কুলছাত্রী

কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। সেক্ষেত্রে যেকোনোরকম প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে মনের ইচ্ছাকে স্থান দেওয়া যায়। বয়সও হার মানে ইচ্ছাশক্তির কাছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা যেখানে বহুভাবেই উপেক্ষিত, সেখানে নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ নারীশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের

স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে প্রিসিল্লা।

অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে। এসব কথা উপলব্ধি করে ও শিক্ষার মর্যাদাকে প্রাধান্য দিতে ৯০টি বসন্ত পেরিয়ে স্কুলের চৌকাঠে পা রাখলেন প্রিসিল্লা সিতেনই নামে এক বৃদ্ধা।

কেনিয়ার এন দালাত-এর রিক্ট ভ্যালি নামক স্থানে ৬৫ বছর ধরে প্রিসিল্লা সিতেনই দাইমার কাজ করেছেন। পুঁথিগত বিদ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। অবশেষে লিডারস ভিসন প্রিপেয়ার স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছেন। গত পাঁচটা বছর তিনি এই স্কুলের ছাত্রী। বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত প্রিসিল্লার বয়স ৯০ হলেও তাঁর সহপাঠীরা তাঁর নাতনির বয়সী, ১০ থেকে ১৪-র মধ্যে। সহপাঠীদের কাছে প্রিসিল্লা খুবই প্রিয়, কাছের মানুষ। বয়সে বিশাল ফারাক থাকলেও মনের দিক থেকে সবাই এক। শারীরিক দিক থেকে প্রিসিল্লা বেশ কিছুটা জবুথবু হলেও দমে যাননি একটুও। মাথায় সবুজ মাঙ্কি টুপি, গলায় লাল টাই, পিঠে স্কুলের ব্যাগ এবং হাতে লাঠি নিয়ে প্রতিদিন তিনি স্কুলে আসেন আর পাঁচটা ছাত্রীর মতোই। ক্লাসের প্রথম সারিতেই প্রিসিল্লা বসতে ভালোবাসেন। ছোট্ট স্কুলপড়ুয়ার মতোই তিনি শুনে শুনে ইংরাজিতে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের নাম লিখে রাখেন তাঁর খাতাটিতে।

এই বয়সে স্কুলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় হাসিমুখে প্রিসিল্লার সাফ জবাব, 'লেখাপড়া শিখে আমি আরো জানতে চাই। আমি ছোটদের প্রেরণা জোগাতে চাই। বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই আর স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছয় না। তারাও কিন্তু একদিন শিশু ছিল। আমি তাদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চাই যে এই বয়সে আমি যদি স্কুলে যেতে পারি, তাহলে তারা কেন যেতে পারবে না।' জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তাঁর যে কিছুই পাওয়ার নেই সেকথা জানেন প্রিসিল্লা। কিন্তু জীবনের চলার পথে শিক্ষাই যে এক এবং অদ্বিতীয় একথা বোঝাতেই তাঁর স্কুলে প্রবেশ। প্রিসিল্লা বলেন, 'আমি বিশ্বের সমস্ত শিশুকে, বিশেষত মেয়েদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে শিক্ষাই তোমার একমাত্র সম্পদ।' প্রিসিল্লাকে তাঁর সহপাঠীরা নাম রেখেছে 'গোগো'। 'গোগো' কথার অর্থ ঠাকুমা। ইংরাজি ভাষার তুলনায় গোগো স্থানীয় কলেনজীন ভাষাতেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

প্রিসিল্লার আগে আরও এক কেনিয়াবাসী কিমানী মরুগে ৮৪ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়ে গিনিস বুকে নাম তুলেছিলেন। কিন্তু ৯০ বছরের প্রিসিল্লা সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। প্রিসিল্লার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ ডেভিড প্রিসিল্লার এই বয়সে স্কুলে আসায় খুব উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, পাঁচ বছর আগে তিনি স্কুলে আসা শুরু করেন। আমরা খুবই গর্ব অনুভব করি তাঁকে নিয়ে। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক জানান, স্কুলে এসে অঙ্ক, ইংরাজি, পি ই, নাচ, গান, নাটক প্রতিটি ক্লাসেই সমানতালে অংশগ্রহণ করেছেন প্রিসিল্লা। সেই সঙ্গে তাঁর সহপাঠীদের উৎসাহ যোগান তিনি। সহপাঠীরা তাঁকে পেয়ে ভীষণ খুশি। তাদের কথায়, আমরা গোগোকে খুবই ভালবাসি। উনি আমাদের সবথেকে প্রিয়। তিনি প্রতিদিন আমাদের ভালো ভালো গল্প শোনান। ∎

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

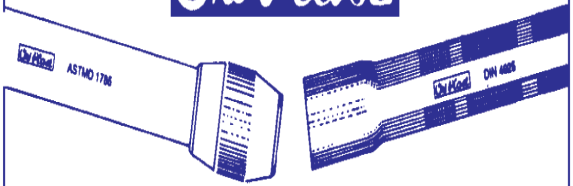

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"বস্তুত হিন্দুধর্ম এক অনন্ত সমন্বয়স্বরূপ। শত শত বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে এর উপাদান সংগৃহীত এবং ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ও বোধগম্য প্রত্যেকটি ভাব এতে সম্মিলিত।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

সমগ্র বৈষ্ণব দর্শন ও সমাজের ভূগোল-ইতিহাসের একটি সুন্দর চিত্র

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী

গ্রন্থটির ভূমিকায় অধ্যাপক ড. প্রদ্যোত ঘোষ 'রামকেলি' স্থানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করেছেন। সব চেয়ে বড় কথা হলো সমগ্র বৈষ্ণব দর্শন ও সমাজের ভূগোল-ইতিহাসের একটি সুন্দর চিত্র এই গ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। ড. ঘোষ নিজ ছাত্রের রচনার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন জেনে ভালো লাগল। এতে আমরাও সমৃদ্ধ হলাম।

একইসঙ্গে প্রকাশকের ভাবনাটিও লক্ষণীয়। প্রকাশক শ্রীযাদবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নিজে দীর্ঘদিন শ্রীমদনমোহন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। সেখানকার ভক্তমণ্ডলীর আন্তরিক চাহিদাকে চৌধুরী মহাশয় হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—'ভাবরসের মাধুর্য নিপুণতায় যে মধুর দৃশ্য দেখেছি তাকে আমি নিজের জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করি।' বৈষ্ণব ভক্তজনের এই ভাবরসের কথাই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক তুষারকান্তি ঘোষ নিজেও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন যে শুধু বৃন্দাবন, পুরী বা পুরুষোত্তম, নবদ্বীপ নয়, মহাপ্রভুর শ্রীচরণস্পর্শে রামকেলিও হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। এই স্থানকে 'দ্বিতীয় বৃন্দাবন' বলা হয়েছে। এটি এক উজ্জ্বল তীর্থস্বরূপ যা পূর্বে অনেকের কাছে অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল। আসলে 'রামকেলি' নামের মধ্যেই রয়েছে এর গভীর ব্যঞ্জনা।

এখানে হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক অর্থাৎ রূপ এবং দবীর খাঁ যিনি পরবর্তীতে সনাতন---এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে তমালবৃক্ষের নীচে দীক্ষা নেন। মদনমোহনের মন্দিরও গড়েন দুই ভাই। আজও সেখানে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহাপ্রভুর স্মরণোৎসব পালিত হয়। সাতদিন ধরে 'জাঁকালো' মেলাও বসে।

গ্রন্থের শেষে লেখক তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত ৬১টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন অতি

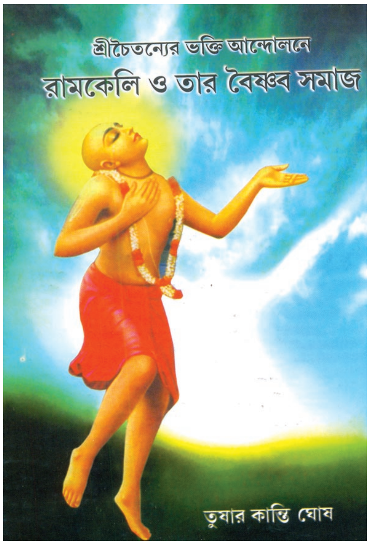

নিপুণভাবে। এছাড়া রূপ-সনাতনের একটি বংশতালিকা দিয়েছেন যা অতি দুর্লভ। গ্রন্থমধ্যে ১৭টি ছবি লেখক সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তা অতি স্পষ্ট ও সুন্দর। যেমন, রূপ- সনাতনের মদনমোহনের মন্দির, তার পরের চিত্রটিতে রয়েছে তমালবৃক্ষ যেখানে সংস্কার করাকালীন শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির। এসব চিত্র দেখতে দেখতে পাঠক চলে যান সেই অতীতে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে প্রতিটি চিত্রের নীচে যদি সাল ও চিত্রসংখ্যার উল্লেখ থাকত তাহলে ভালো হোত। আর একটি আলোচনার অভাব অনুভব করেছি। সেটি হলো রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিয়ে কথোপকথন। লেখক এর একটু আভাস দিলে পাঠকের মন তৃপ্তি লাভ করত।

গ্রন্থটির দশটি অধ্যায় যেন হীরকের দ্যুতির ন্যায় উজ্জ্বল। সর্বশেষে যে মানচিত্রটি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন নিশ্চিত। গ্রন্থটিতে ২২৪ পৃষ্ঠা আছে, প্রতিটি পৃষ্ঠা ও ছাপা অতি চমৎকার। সেদিক থেকে দেখলে বইটির মূল্য খুবই সুলভ বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের আন্তরিক ইচ্ছা---গ্রন্থটি যেন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

সর্বোপরি গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট অতি চমৎকার যা দেখে বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের একটি বিখ্যাত পদের কথা মনে পরে যায়—'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে / পুলক মুকুল অবলম্ব / স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত / বিকশিত ভাব-কদম্ব।'

গ্রন্থের প্রাক্-কথন উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। এর পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল মুদ্রণ, সুন্দর কাগজ ও বাঁধাই এবং সুলভ মূল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। ভবিষ্যতে অনেক বৈষ্ণব গবেষকের কাছে এই গ্রন্থ একটি সুন্দর নির্দেশিকা হিসাবে গণ্য হবে। এমন একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকারকে অশেষ সাধুবাদ।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে রামকেলি ও তার বৈষ্ণব সমাজ।
তুষারকান্তি ঘোষ
মূল্য : ১২৫ টাকা।
পরিবেশক : পুস্তক বিপণি।
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

উদ্ধারিত তৃষিত পীড়িত মানব প্রাণে
আসিও যুগে যুগে তুমি বিশ্ব ভুবনে।।

সুজলা, সুফলা, সবুজ, শ্যামলা বৃক্ষরাজিতে সুসজ্জিত ছায়াঘেরা, স্নিগ্ধ সলিলে প্রবাহিত ছোট নদী কণ্ঠে, বিহগের কাকলি কল্লোলিত, ভ্রমর গুঞ্জিত, ফুলে ফলে সমাহিত অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বাজিতপুর এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৮৯৬ সালে এই গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন জননী সারদার কোল আলো করে ভূত ভবিষ্যদ্বেত্তা, ত্রিকালদর্শী, দিব্যদ্রষ্টা, শিবাবতার, মহাসাধনার সেবামূলক ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য নিয়ে গুরুশ্রেষ্ঠ চিরমুক্ত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষরূপে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তিনি চেয়েছিলেন মানব জাতিকে দিব্যশক্তির প্রেরণায় আপ্লুত করে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ। সেবার মাধ্যমে দুঃখী, দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিত, অত্যাচারিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপন্ন, মানুষের রক্ষার ব্যবস্থা ও উন্নতি, পতিত দলিত সমাজের উদ্ধার, সমাজগঠন, মানুষের চরিত্র গঠন। প্রতি মানব প্রাণের দুর্বল মানসিকতায় শক্তি সঞ্চার করে সমাজের স্বল্পশক্তি সম্পন্ন মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে। ছিন্নভিন্ন হিন্দুজাতির মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তি, মানসিক বল, আত্মচেতনা। তিনি এই সকল প্রচেষ্টা করতেন ধর্মের ভাবে সমাজের মনোবৃত্তি স্থাপনা করে আধ্যাত্মিক কর্ম কৌশলের মাধ্যমে। ভগবদ্‌বিশ্বাসীদের মোক্ষপ্রাপ্তির পথে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক প্রকার সাধনার পথ নির্দেশ আছে। যোগৈশ্বর্যশালী আত্মকল্যাণে উন্নত মহাপুরুষই এই সাধনার পথ প্রদর্শক। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ছিলেন এমন একজন নিত্যসিদ্ধ সাধক যিনি নিজের কল্যাণের সঙ্গে চাইতেন সমাজের কল্যাণ। সেই কল্যাণের পথে সকল প্রকার বিঘ্নকে পদদলিত করে ঈপ্সিত উন্নতির শিখরে পদার্পণ করতে। অপশক্তিকে নিধন করতে প্রয়োজন শারীরিক, মানসিক তেজোদীপ্ত সাহস, বীরত্বপূর্ণ স্পৃহা, সাধনশক্তি, সঙ্ঘশক্তি, নীতি ও আদর্শের ভিত্তি স্থাপন। তাই শরীর চর্চার জন্য ব্যায়ামাগারের সৃষ্টি করে লাঠি, তলোয়ার, ত্রিশূল, খঞ্জর প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যার্থী ভবন, স্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি বিভিন্ন সেবার উৎসমুখ খুলে দিলেন। সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম, সেবাই পরকালের পাথেয়। সকল প্রকার সেবার মাধ্যমে নিষ্পেষিত, নিপীড়িত বেদনাতুর আত্মার অশ্রুমোচন, সমাজের অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে ব্রতী হলেন। এমনই এক সদিচ্ছাময় কর্মপদ্ধতির দ্বারা চাইতেন সকলকে অনুপ্রাণিত করতে। আচার্যদেব ছিলেন দৃঢ়সঙ্কল্পের অধিনায়ক। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু সঙ্ঘশক্তি, সামূহিক শক্তি ছাড়া দুর্বৃত্তকে দমন করা যায় না, তাই তিনি ধর্মের উপর ভিত্তি করে আদর্শনীতির সঞ্চালনে চেয়েছিলেন সমাজের নির্যাতন দূরীকরণ। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, হিন্দুরক্ষীদল গঠন করে সঙ্ঘশক্তি রচনা করেছেন। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দুজাতি সবচেয়ে বেশি অসংগঠিত, দুর্বল, শক্তিহীন। যদিও এই কথা হিন্দুজাতির পক্ষে সংকোচজনক। শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হিন্দুজাতির বিশৃঙ্খলতা বীরত্বের পরিচায়ক নয়। দুর্নীতির সহায়ক মনোবৃত্তি শক্তির অপচয়। তিনি বিশ্বাস করতেন শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়। সম্পর্ক কণ্টকমুক্ত হয়, শান্তির স্ফুরণ যোগায়। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মিলন, কাজের সঙ্গে কাজের মিলন, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনেই সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে মিলনের মধ্যেই দেশ, জাতি, সমাজের উন্নতি, অভ্যুদয় ও কল্যাণ সাধিত হয়।

তিনি ভেবেছিলেন সংসারে থেকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের সেবা, উন্নতি ও অভ্যুদয় করা অসম্ভব। তাই তিনি সন্ন্যাসীর পথে শুরু করেছিলেন আকাঙ্ক্ষিত কর্মপদ্ধতি। ১৯১৭ সালে স্থাপনা করেছিলেন এক ধর্মীয় সংস্থা। নাম দিয়েছিলেন **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ**। সমগ্র ভারতবর্ষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু কর্মের স্রোত এমন প্রভাবিত হলো যে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের জন্য মানবজাতির এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। আজ আর শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত। সারা বিশ্বের মিলনের প্রেরণাদায়ক এই আশ্রমের কর্মের প্লাবন অতি বৃহৎ, বিশাল আকারে মহাসিন্ধুর কল্লোলে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, চলবে। সেবার প্রতি উদাসীন মানেই ধর্মীয় সংস্থার পতনের বীজ রোপণ। তাই এই প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীরা দিনরাত্রি সেবাকাজে নিয়োজিত। মানব জাতির সর্বপ্রিয় ও গর্বের এই সঙ্ঘের আজ শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। সমাজের ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে, পথে প্রান্তরে, সঙ্ঘের সেবার যে ভূয়সী প্রশংসা প্রচলিত, যুগের অন্তিমকাল পর্যন্ত যেন তার আয়ুষ্কাল চিরঅক্ষুণ্ণ রাখতে পারি—সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার কাছে আমার এই করুণ প্রার্থনা। ক্ষমতার অহঙ্কারে টুকরো হয়ে ধূলিকণায় ঝরে না পড়ে। ত্যাগের মহিমায় আপ্লুত সঙ্ঘের আশ্রিত সকল সঙ্ঘ-সন্তানরা শান্তির পরশ নিয়ে জীবনের ঈপ্সিত কর্মসাধনায় জীবন সমর্পণে সেই করুণাময় শ্রীগুরুর চরণে বিলীন হতে পারি এই নিবেদন।

(লেখক গুজরাটের গান্ধীনগর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী)

কলকাতায় একনাথ রানাডের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার শ্রী শিক্ষায়তন স্কুলে বিবেকানন্দ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা একনাথ রানাডের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবির, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ মহারাজ এবং বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিবেদিতা ভিড়ে। সভাপতির ভাষণে বিচারপতি কবির বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিয়েছিলেন সমস্ত মানুষকে 'নারায়ণ' রূপে সেবা করতে।' তিনি উল্লেখ করেন কন্যাকুমারী স্মৃতিমন্দিরে ধ্যানকক্ষে ওম উচ্চারণের সুন্দর ধ্বনির অভিজ্ঞতার। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী সুহিতানন্দ মহারাজ বলেন, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে একনাথজীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।' নিবেদিতা ভিড়ে বলেন, 'একনাথ রানাডে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করেছিলেন। অনুষ্ঠানে ২৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সম্মেলন

গত ২৩ জানুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন যৌথভাবে বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার কাজের প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক আশিস কুমার মণ্ডল। শ্যামল মুখোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের দেশাত্মবোধ ও তাঁর আপসহীন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি সারা ভারতে প্রতিটি একককে শিক্ষকদের 'কর্তব্য বোধ কালখণ্ড' হিসেবে পালন করা হয়। ওই কর্মসূচির সমারোপ অনুষ্ঠানও এই সম্মেলনে পালন করা হয়। রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল শিক্ষকদের কর্তব্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ থাকে যে, ২০১৪ সালকে সারা দেশে 'শিক্ষায় শাশ্বত জীবন মূল্য' প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশে সভা সমিতি ও স্মারক লিপি প্রদানের মাধ্যমে পালন করা হয় এবং এই কাজ ২০১৫ সালেও চলতে থাকবে। সঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন, দায়িত্বশীল শিক্ষকদের দ্বারাই যেন সুদৃঢ় সংগঠন তৈরি করা হয়। অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে যার একান্তই অভাব। সম্মেলন সুনিপুণ ভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক রাজদীপ মিশ্র। সম্মেলনে শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন অপূর্ব কুমার পাত্র এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন রাজেন্দ্র সিংহ। আরও ১১টা চক্রের প্রতিনিধিদেরও এই কমিটিতে রাখা হয়।

উত্তরবঙ্গ বিদ্যাভারতীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের তত্ত্বাবধানে নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের ব্যবস্থাপনায় নবম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবছর নকশালবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের শুভ সূচনা করেন নকশালবাড়ির যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সেঁজুতি পাল মাইতি।শিশুমন্দিরের শিক্ষার্থী ভাইবোন, প্রাক্তন বিদ্যার্থী, অভিভাবক- অভিভাবিকা-সহ প্রায় ২০০০ জন এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। ঘোষবাদ্য ও বিভিন্ন ট্যাবলো এই শোভাযাত্রাকে বর্ণময় করে তোলে।

৮ ফেব্রুয়ারি নকশালবাড়ির বীরসা মুণ্ডা আদিবাসী ময়দান ও নন্দ প্রসাদ উচ্চ বালিকা

মণিপুরে রানী গাইদিনলিউ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান

গত ১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মণিপুরের আইবোয়াইমা শাংলেন প্রাসাদ পরিসরে স্বাধীনতা সংগ্রামী নাগারানী গাইদিনলিউয়ের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মণিপুর বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীমতী মৃদুলা সিংহ। শ্রীমতী সিংহ প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক গাংমুমেই কামেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রানীমার ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা অধ্যাপিকা বিমলা দেবী মণিপুরের বর্তমান প্রজন্মের কাছে রানীমার দেশের জন্য আপোসহীন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের মহারাজা লইশেম্বা সানাজাওবা, অধ্যাপক লাংবিলুং গোলমেই, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা, কল্যাণ আশ্রমের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিকি দোমা, কল্যাণ আশ্রমের মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী থাহোই প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী শান্তাক্কা গোয়ার রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানান তিনি যেন ভারত সরকারকে রানী গাইদিনলিউয়ের নামে 'স্ত্রীশক্তি সম্মান' প্রদানের ব্যবস্থা করে দেন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় ১৬০০ মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। মণিপুরের পরম্পরাগত নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য, মণিপুরের স্থানে স্থানে রানীমার জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন দার্জিলিং-য়ের রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী মহারাজ। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার ১৪টি সস্কুল থেকে ১৩৭ জন শিক্ষার্থী ভাইবোন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম স্থান মাথাভাঙ্গা স্কুল ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রায়গঞ্জ স্কুল।

উত্তরপাড়ায় ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি সংস্কার ভারতীর উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে ভদ্রকালী দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন নবকুমার দেব মঞ্চে ভারতমাতা পূজন দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি, নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা তপন গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গের সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। তপন গঙ্গোপাধ্যায়, গুরু বিশ্বাস এবং নীলাঞ্জনা রায় সংস্কার ভারতীর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সকলের সামনে তুলে ধরেন। পরে শাখার শিল্পীদের সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, একক সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। স্থানীয় মানুষের মধ্যে সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠান দেখার পর উৎসাহের সঞ্চার হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শাখার সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস।

শোকসংবাদ

গত ২৯ জানুয়ারি বসিরহাট জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা সর্বজন

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পশুপতি সরদার পরলোকগমন করেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ করার পর তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জেলায় সঙ্ঘ কাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। কেবলমাত্র সঙ্ঘ নয়, আর্যসমাজ, কিষাণ সঙ্ঘ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সরস্বতী শিশুমন্দির, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা এবং অগণিত স্বয়ংসেবক ও বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

***

গত ১২ ফেব্রুয়ারি নীরেশ চন্দ্র বর্মন ৬৭ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের সোনারকুঠি গ্রামের স্বয়ংসেবক ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর রাধামাধব মন্দির নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা, নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর বাড়ি প্রচারক ও স্বয়ংসেবকদের নিকট অবারিতদ্বার ছিল।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ফেভারিট দক্ষিণ আফ্রিকা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবারই দেশটি আসে ফেভারিটের তকমা নিয়ে আর অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ‘চোকড’ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট টিম যেন এক প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধন্ধে ফেলে দিতে এই দলটির জুড়ি মেলা ভার। সমস্তরকম পূর্বাভাস সমীক্ষা যেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ক্লাইম্যাক্সের সামনে আটকে যায়। এবারও কি তাই হবে নাকি শিকে ছিঁড়তে পারে গ্রোটিয়াসদের। যে রকম ফর্ম ও প্রস্তুতি নিয়ে ওই দেশের সব ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে এসেছে বিশ্বকাপ খেলতে, এরপরও যদি পূর্ব ইতিহাসের সমপরিণতি হয় তাহলে বলতে হবে দেশটির বিশ্বকাপ জেতার যোগ্যতা ও ভাগ্যের মধ্যে কোথাও একটা অদৃশ্য সীমারেখা রয়ে গেছে।

এ বি ডি ভি লিয়ার্স কদিন আগেই দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড করেছেন। একদিনের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি যে কোনো পজিশনে নেমে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করতে থাকেন। অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন হাসিম আমলা, জেপি দুমিনি, দুপ্লেসী, এলগাররা। গ্রেম স্মিথ ও জ্যাক কালিসের মতো দুই মাস্টার ব্যাটারকে ছাড়াই যেভাবে ওয়েস্টইন্ডিজকে দুরমুশ করে বিশ্বকাপে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, তা সব ফেভারিট দলের কাছে আতঙ্কস্বরূপ। দীর্ঘ দু' দশক বর্ণবৈষম্য নীতির কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত থাকার পর ১৯৯১-এ বিশ্ব ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে আসে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরের বছরই অস্ট্রেলিয়ায় বসেছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর।

বিশ্বকাপে প্রথম আবির্ভাবেই চমক সৃষ্টি করে কেপলার ওয়েসেলসের টিম। তাদের দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি পারফরমেন্স দিয়ে ঢেকে দিতে পেরেছিল। আগ্রাসী ও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে সেমিফাইনালে উঠে যায় স্বচ্ছন্দে। আর তারপরই চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আগাগোড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রাধান্য নিয়ে খেলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস সিস্টেমের বলি হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। অথচ ম্যাচে তাদের প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর ১৯৯৬, ১৯৯৯ বিশ্বকাপে যথেষ্ট শক্তিশালী দল নিয়ে এসেও মোক্ষম সময়ে ‘ফোকাস’ ঠিক রাখতে না পেরে কাপ অভিযান শেষ হয়ে যায় তাদের। ২০০৩-এর বিশ্বকাপ নিজেদের দেশে বসিয়েও ফায়দা তুলতে পারেনি। সেবার অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হলেও দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা আরও জমাট, সুবিন্যস্ত ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক নম্বরে রেখে বাকি আরও ২/৩টি দলকে নিয়ে কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণ চলছে ক্রিকেট বোদ্ধাদের। এর মধ্যে ভারতও আছে। অস্ট্রেলিয়া নিজের মাঠে খেলছে বলে একটু এগিয়ে থাকবে এই দলগুলির মধ্যে। তবে টিমটা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রিকিপন্টিং, ম্যাথুহেডেন, অ্যাডম গিলক্রিস্ট, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, সেন ওয়ার্ন, ব্রেটলির উত্তরসূরি এখনো খুঁজে বের করতে পারেনি। তারপর মাইকেল ক্লার্ককে পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। ক্লার্ক খেলতে না পারলে ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ ও অধিনায়ক জর্জ বেইলির ওপর ভীষণ চাপ পড়ে যাবে। বোলিং লাইন আগেও মিচেল জনসন ছাড়া তেমন অভিজ্ঞ কেউ নেই। তবে চোটমুক্ত জেমস প্যাটিনসনকে পাওয়া গেলে পেস আক্রমণে একটা ঝাঁঝ আসবে। এছাড়া মিচেল স্টার্কের ওপর ভরসা করা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি, মুভিং উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যদি স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে তবে অতীতের কালো অধ্যায় খুঁজে দেওয়া সম্ভব হবে। বরাবরই সে দেশে গিয়ে কাস্টবোলিংয়ের সামনে কেঁপে গেছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। এবার বিশ্বকাপের আগে দু' মাস সেদেশে থেকে টেস্ট, একদিনের এদেশিয় সিরিজ খেলে অনেকটা ধাতস্ত হয়ে বিশ্বকাপে নামার সুযোগ পাচ্ছে এম এস ডি-র ছেলেরা। যদিও ১৯৯১- ৯২-তেও একই ব্যাপার হয়েছিল আর তারপরেই বিশ্বকাপ খেলতে নেমে চূড়ান্ত বিপর্যয়। এবারও কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে, সন্দেহটা ঘুরপাক খাচ্ছে সন্দিগ্ধ মহলে। যদিও এই দলটিতে ২-৩ জন অলরাউন্ড ব্যাটসম্যান আছে, যারা যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে। আর এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বিরাট কোহলির। কোহলিকে ব্যাটিং বিভাগের নেতৃত্ব দিতে হবে আর পার্টনারদের স্বাভাবিক খেলা বের করে আনতে হবে নিজের আগ্রাসী ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাটসম্যানদের মাধ্যমে। তবে বোলিং নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েই গেছে। এই বোলিং নিয়ে পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে ফায়দা তোলা কঠিনই হয়ে যেতে পারে। তাই ভারতকে ভাল কিছু করে দেখাতে হলে চার প্রধান ব্যাটসম্যানকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত ছাড়া পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ডের দিকেও নজর রাখতে হবে। এই তিন দলই ইদানীং যথেষ্ট কার্যকরী ক্রিকেট খেলছে।

শব্দরূপ-৭৩৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১			২	■	■	৩
৪		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■	১৩	
	■	■	১৪				■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী প্রদেশের নৃপতি, **৪.** পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রগুরু, **৫.** গঙ্গাবতরণ দিন, জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমী, **৭.** কাছারি, অফিস, **৯.** প্রাবল্য, হঠাৎকার, বেগ, **১১.** কোথাও আগুন লাগলে এরা ঘন্টি বাজিয়ে ছুটে চলে, **১৩.** কদলীতে অপ্সরা, **১৪.** মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা।

উপর-নীচ : ১. অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগুরু, **২.** 'আজ—, কাল ধার', **৩.** বিরাট রাজকন্যা, অভিমন্যুপত্নী, **৬.** মৃচ্ছকটিক নাটকে অতি দুর্জন রাজপুরুষ, রাজার শ্যালক, **৮.** 'যে---, সেই ভক্ষক' (প্রবচনে), **১০.** সগর রাজার প্রপৌত্র যিনি পৃথিবীতে গঙ্গা এনেছিলেন, **১১.** ক্রিয়াকর্মের অন্তে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ইত্যাদির প্রাপ্য অর্থ, **১২.** একপ্রকার বাগ্‌ভঙ্গি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	পি	পী	লি	কা	■	পূ
পি	না	ক	■	■	শ্মী	■	ত
■	ট	■	শু	■	র	স	না
■	ম	রী	চি	■	■	চ্চি	■
■	ন্দি	■	■	অ	ন্ন	দা	■
চ	র	ক	■	স্বা	■	ন	■
ড়	■	লা	■	■	ম	ন্দ	র
ক	■	প	ঞ্চা	য়ে	ত	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৩৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ মার্চ ২০১৫ সংখ্যায়

Make
Swachh Bharat
Mission
A Great
Success.

- A Senior Citizen of India

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ১৫

স্বস্তিকা জাতীয় ভাবনার বাহক। সেই ভাবনা স্বস্তিকার মাধ্যমে যাঁরা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত তাঁরা স্বস্তিকার কার্যকর্তা

আপনার এলাকায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম ঠিকানা

পশ্চিম মেদিনীপুর

- **লক্ষ্মীকান্ত দাস, চাঙ্গুলা**
  খড়্গাপুর
  ৯৯৩৩৯৫৩২৫৯
- **মদন রুহিদাস,** কেশারী
  ৮১৪৫৩৩৩৫০৯
- **অমলেন্দু দাস,** ঝাড়গ্রাম
  ৯৮৩২২৮৩০০১
- **কে সি দাস,** করকাই
  ৯৮০০২৪৩০৬৬
- **নিত্যানন্দ দত্ত,** মাদপুর
  ৯০০২৬৪৩৪৪২
- **সমীরণ গোস্বামী**
  মেদিনীপুর শহর
  ৯৮৫১৩৯৩৯৪৮
- **গুরুপদ মণ্ডল,** গড়বেতা
  ৮০০১৮৭৬৯৪৫
- **মনোরঞ্জন দাস,**
  গোয়ালতোড়, গড়বেতা
  ৯৫৬৪৪৫১৬৯৯
- **কৃষ্ণপ্রসাদ বসু,** নারায়ণগড়
  ৭৬৯৯০৪৩৯৯০
- **অনুপ কুমার মাইতি**
  মঠচণ্ডীপুর, কালিকাখালি
  ৯৭৭৫২৫৭১৭৪
- **প্রশান্ত কুমার রাণা,** ঘাটাল
  ৯৪৩৪০৮৬২৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

- **কালীপদ মাইতি**
  ভগবানপুর
  ৮০০১৪৩৯২২২
- **নিমাইচন্দ্র বেরা**
  তমলুক
  ৯৯৩২৭৬৪৫৪৭
- **বিজন পাণিগ্রাহী**
  মহিষাদল
  ৯৭৩৩০৯৩৬৭৬
- **নিত্যানন্দ পণ্ডা,** এগরা
  ৯৭৩৪৪১৪৫০২
- **কমলেশ জানা**
  দেভক, হলদিয়া
  ৯৬৩৫৭৪৭৮৯৮
- **প্রভাত নন্দ,** কাঁথি
  ৯৪৩৪২৫৮৪৩৫
- **প্রসুন মিশ্র**
  নন্দকুমার বাজার
  ৯৪৩৪৮৫৪১০৭
- **হরিসাধন পণ্ডা,** কাঁথি
  ৯৬১৪৮০৭৬৮৪
- **নারায়ণ মাইতি**
  মেছেদা
  ৯৪৩৪৪১৪২৪৭
- **কণিষ্ক পণ্ডা**
  কাঁথি
  ৯৭৩২৮২১০৩৯
- **রতন প্রামাণিক**
  রামতারকহাট
  ৯৯৩২৫০১৫৩০
- **নির্মল মান্না**
  সাবড়া, দাঁতন
  ৯৮৩২৫৭৯০৪৮

বীরভূম

- **সনাতন চ্যাটার্জি**
  রামপুর হাট
  ৯৬৭৯৮০৩০২৯
- **রামকৃষ্ণ মণ্ডল**
  ময়ূরেশ্বর
  ৯১৫৩২৩৯১৫১
- **প্রতাপ দাস**
  নলহাটি
  ৯১৫৩০৯২৪৫২
- **গৌতম মণ্ডল**
  মল্লারপুর
  ৮৯০০৪৪০২৪৩
- **প্রভাস কুমার কোনাই**
  তারাপুর
  ৯৪৩৪৯৪৭৩৬৯
- **দেবাশিস ভট্টাচার্য**
  সিউড়ী
  ৯৭৭৫৩৯৭৯৯৬
- **অসীম কুমার চৌধুরী**
  বোলপুর
  ৮৪৭৮৮২৫১৬৩
- **বিশ্বজিৎ সিংহ**
  আমোদপুর
  ৯১৫৩৪৭২০৪৫
- **প্রণব কুমার দত্ত**
  খয়রাশোল
  ৯৯৩২৫৭৬৯৭৪
- **অষ্টম মণ্ডল**
  কীর্ণাহার
  ৮৫৩৭৯০০৫৮০
- **গৌরব রায়**
  বোলপুর
  ৮২৯৩৩০৬৬২৫

হাওড়া মহানগর

- **নরেন্দ্র কুমার সিংহ**
  বাকসারা
  ৯৪৭৫৫০-৫৪৯৮
- **কাঞ্চন ভট্টাচার্য**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩৬৬২২০৯৫
- **কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩১৬৩৩৩৭৮
- **গোবিন্দ নন্দী**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩১৪০৮৩৬৯
- **নৃপেন সামন্ত**
  মৌড়ীগ্রাম
  ৯০৩৮৬৯৮২৫৪
- **সৌরেন্দ্র সামন্ত**
  বাকসাড়া
  ৯৪৭৫৫০৫৪৯৮

হাওড়া জেলা

- **শিবব্রত মণ্ডল,** মুন্সীরহাট
  ৯৯৩২১৫১৪৪৭
  ৯৫৬৩৫২০২৪৮
- **তাপস ভট্টাচার্য**
  উদয়নারায়ণপুর
  ৯৭৩২৪৩৭৯৩৩
- **কৃত্তিবাস জানা**
  উলুবেড়িয়া
  ৯২৩৯৭২৪৭০৩
- **অসিত মণ্ডল**
  আমতা, খড়িয়প
  ৯৯৩৩৪৪৯৩৬০
- **তপন রীত**
  আমতা, তাজপুর
  ৭৬০২৩৭৭৯৪৯
- **আবীর ভট্টাচার্য**
  বাগনান
  ৯৪৩২৫৬৯৯৫৮
- **বুদ্ধদেব গোস্বামী**
  উদয়নারায়ণপুর
  ৯৬০৯২৭৯২৯৫
- **প্রদ্যুৎ পাত্র**
  রাণীহাটি
  ৯১৪৩০৭৪০৭০
- **মিহির সামন্ত**
  শ্যামপুর
  ৯৭৩৩৯৫৬৫২৩
- **সুন্দর ঘোষ**
  ডোমজুড়, বেগড়ী
  ৯৮৩৬৮৯৪৬২৮

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
23 February - 2015